সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ।

চার্ব্বাক দর্শন।

চার্ব্বাক দর্শনের তাৎপর্য্য এই যে, পুরুষ যত কাল জীবিত থাকিবে, কেবল সুখের উপায়ই চেষ্টা করিবে। যখন সকল ব্যক্তিকেই কালগ্রাসে পতিত হইতে হইতেছে, আর মৃত্যুর পর বন্ধুজনেরা শবদেহ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলে উহাতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিতেছে না, তখন যাহাতে সুখে জীবন যাপন হয় এমত চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পারলৌকিক সুখলিপ্সায় ধর্ম্মোপার্জ্জনে আত্মাকে সাতিশয় কষ্টভাগী করা নিতান্ত মূঢ়তার কর্ম্ম, যেহেতু ভস্মীভূত দেহের পুনর্জ্জন্ম কোন প্রকারেই সম্ভাবিত হইতে পারে না। পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারি ভূত হইতে দেহের উৎপত্তি হয়। যদিও ভূত সকল অচেতন, তথাপি তাহারা মিলিত হইয়া দেহরূপে পরিণত হইলে তাহাতে চৈতন্য জন্মে। হরিদ্রা পীতবর্ণ ও চূর্ণ শুক্লবর্ণ, কিন্তু উভয়ে মিলিত হইলে তাহাতে রক্তিমার উৎপত্তি হয়; গুড় তণ্ডুল প্রভৃতি দ্রব্য প্রত্যেকে মাদক নহে, কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য দ্বারা সুরা প্রস্তুত হইলে তাহাতে মাদকতা শক্তি জন্মে। সেইরূপ এই দেহ অচেতন পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইলেও তাহাতে চৈতন্যগুণের উৎপত্তি অসম্ভাবিত নহে। আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি গৌরবর্ণ, আমি শ্যামবর্ণ ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারেও আত্মাই

স্থূল কৃশাদিভাবে হৃদয়ঙ্গম হইতেছে; কিন্তু স্থূলতাদিধর্ম্ম সচেতন ভৌতিক দেহেই লক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সচেতন দেহই আত্মা, তদতিরিক্ত আত্মা নাই।

এই মতে প্রত্যক্ষমাত্র প্রমাণ, অনুমানাদি প্রমাণ নহে। আর কামিনীসম্ভোগ, উপদেয় দ্রব্য ভক্ষণ ও উত্তম বসন পরিধানাদি দ্বারা সমুৎপন্ন সুখই পরম পুরুষার্থ। যদিও এই সমস্ত সুখের আস্বাদন করিতে হইলে, তৎসহযোগে দুঃখনিবহেরও ভোগ অপরিহার্য্য, তথাপি তাহাতে অনাস্থা প্রকাশ করিয়া তত্তৎ সুখ সম্ভোগ করাই সকলের উচিত। দেখ, কষ্টকর কন্টক ও শল্কাদি পরিবৃত বলিয়া কেহই সুস্বাদু মৎস্য ভক্ষণে পরাঙ্মুখ হয়েন না, এবং তুষাদি অসারাংশসম্বলিত বলিয়া কেহই পুষ্টিকর ধান্য পরিত্যাগ করেন না; প্রত্যুত সকলেই উহাদিগের কন্টক তুষাদি অসারাংশ অপনয়ন করিয়া সারাংশ গ্রহণ দ্বারা তৃপ্তি সুখ প্রাপ্ত হয়েন। পশুগণদ্বারা শস্যাপচয় হইবে বলিয়া কি কেহ ধান্যবীজ বপন করিবেন না? না ভিক্ষুক দ্বারা বিরক্ত হইবার ভয়ে অন্নাদি পাক করিয়া ভোজন করিবেন না? অবশ্যই করিবেন। অতএব সুখানুষঙ্গী অবশ্যম্ভাবী দুঃখে ভীত হইয়া সুখোপভোগে বিরত হওয়া অতি মূঢ়তার কর্ম্ম।

অনেকানেক প্রধান পণ্ডিতেরা অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন হইয়াও বহু ধন ব্যয় ও শরীরায়াস স্বীকারপূর্ব্বক বেদনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন, ইহাতে আপাততঃ বোধ হইতে পারে অবশ্যই পরলোক থাকিবে। বস্তুতঃ পরলোক নাই। তবে যে তাঁহারা ঐ সকল নিষ্ফল কর্ম্মে

প্রবৃত্ত হয়েন তাহার কারণ এই যে, কতিপয় প্রতারক ধূর্ত্তেরা বেদের সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে স্বর্গ নরকাদি নানা প্রকার অলৌকিক পদার্থ প্রদর্শন করত, সকলকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং তাহারা স্বয়ং ঐ সকল বেদবিধির অনুষ্ঠান করত জনসমাজের প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছে এবং রাজাদিগকে যাগাদিতে প্রবৃত্ত করাইয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিপুল অর্থ লাভ করিয়া নিজ নিজ পরিজন প্রতিপালন করিয়াছে। তাহাদিগের অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া, উত্তরকালীন লোক সকল ঐ সমস্ত বেদোক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করাতে, বহু কালাবধি এই প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। বৃহস্পতি কহিয়াছেন অগ্নিহোত্র, বেদাধ্যয়ন, দণ্ডধারণ, ভস্মগুণ্ঠন এই সমস্ত বুদ্ধিপৌরুষহীন ব্যক্তিদিগের উপজীবিকা মাত্র। বেদে লিখিত আছে পুত্রেষ্টিযাগ করিলে পুত্র জন্মে, কারীরীযাগ করিলে বৃষ্টি হয়, শ্যেনযাগ করিলে শত্রুনাশ হয়। তদনুসারে অনেকেই ঐ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু কোন ফলই দৃষ্ট হইতেছে না। এক স্থানে বিধি আছে সূর্য্যোদয় হইলে অগ্নিহোত্র যাগ করিবে, অন্য স্থানে কহিতেছে, সূর্য্যোদয়ে হোম করিবেক না, যে ব্যক্তি সূর্য্যোদয়ে হোম করে, তাহার প্রদত্ত আহুতি রাক্ষসের ভোগ্য হয়। এইরূপে বেদে অনেক বাক্যের পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং উন্মত্তপ্রলাপের ন্যায় বারম্বার এক কথার উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। যখন এই সমস্ত দোষ দেখা যাইতেছে, তখন কি প্রকারে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা যাইতে পারে। অতএব স্বর্গ, অপবর্গ ও পারলৌকিক আত্মা সমস্তই মিথ্যা এবং

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রমের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকলও নিষ্ফল। ফলতঃ অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্ম সকল অবোধ অক্ষম ব্যক্তিদিগের জীবনোপায়মাত্র।

ধূর্ত্তেরা ইহাও কহিয়া থাকে যে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে যে জীবের ছেদন হইয়া থাকে সে স্বর্গলোকে গমন করে। যদি ঐ ধূর্ত্তদিগের ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, তবে তাহারা যজ্ঞেতে আপন আপন পিতা মাতা প্রভৃতির মস্তকচ্ছেদন না করে কেন? তাহা হইলে অনায়াসে পিতা মাতা প্রভৃতির স্বর্গলাভ হইতে পারে, এবং তাহাদিগকে আর পিতা মাতার স্বর্গের নিমিত্ত, শ্রাদ্ধাদি করিয়া বৃথা কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। আর শ্রাদ্ধ করিলে যদি মৃত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তবে কোন ব্যক্তি বিদেশে গমন করিলে তাহাকে পাথেয় দিবার প্রয়োজন কি। বাটীতে তাহার উদ্দেশে কোন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেই তাহার তৃপ্তি জন্মিতে পারে। অপিচ, এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে যদি স্বর্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তবে অঙ্গনে শ্রাদ্ধ করিলে প্রাসাদোপরিস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি না হয় কেন? যাহাতে কিঞ্চিদুচ্চস্থিতের তৃপ্তি হয় না, তদ্দ্বারা অত্যুচ্চ স্বর্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে! অতএব মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে যে সমস্ত প্রেতকৃত্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা ব্রাহ্মণদিগের উপজীবিকা মাত্র, বস্তুতঃ কোন ফলোপধায়ক নহে।

কিঞ্চ, এই দেহ ভস্মাবশেষ হইলে, কোন প্রকারে তাহার আর পুনরাগমনের সম্ভাবনা থাকে না। অতএব যত কাল পর্য্যন্ত জীবন থাকে, সুখস্বচ্ছন্দে অবস্থান করাই উচিত; অধিক কি, ঋণ করিয়াও ঘৃতাদি পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করা

বিধেয়। যদি শরীর হইতে আত্মা পরলোক গমন করে এবং তাহার দেহান্তরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা থাকে, তবে বন্ধু-বান্ধবের স্নেহে ঐ দেহেই পুনরায় না আইসে কেন ?

ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও রাক্ষস এই ত্রিবিধ লোক একত্র হইয়া বেদ রচনা করিয়াছে। অশ্বমেধ যজ্ঞে যজমানপত্নী অশ্বশিশ্ন গ্রহণ করিবে ইত্যাদি বিষয় সকল ভণ্ডের রচিত। স্বর্গ নরকাদি বিষয় সকল ধূর্ত্তের প্রণীত। এবং যে সকল অংশে মদ্য মাংস নিবেদনাদির বিধি আছে, তাহা নিশাচরের কল্পিত। অতএব বেদশাস্ত্র মিথ্যা, বুদ্ধিমান্ লোকেরা কোন মতেই তাহাতে বিশ্বাস করেন না।

বৌদ্ধদর্শন।

বৌদ্ধেরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত; মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক। মাধ্যমিক মতে কিছুই নাই, সকলই শূন্য। যে সমস্ত বস্তু স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, জাগ্রদবস্থায় তাহার কিছুই দেখা যায় না, এবং যে সমস্ত বস্তু জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, স্বপ্নাবস্থায় তাহার কিছুই দেখা যায় না; আর সুষুপ্তিদশায় কোন বস্তুই দেখা যায় না। ইহাতে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বস্তুতঃ কোন বস্তুই সত্য নহে; সত্য হইলে অবশ্যই সকল অবস্থায় দৃষ্ট হইত। যোগাচারমতে বাহ্যবস্তুমাত্রেই অলীক, কেবল ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ আত্মাই সত্য। ঐ বিজ্ঞান দুই প্রকার, প্রবৃত্তিবিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞান। জাগ্রৎ ও সুপ্ত অবস্থায় যে জ্ঞান জন্মে তাহাকে প্রবৃত্তিবিজ্ঞান

বলে, আর সুষুপ্তিদশায় যে জ্ঞান হয় তাহার নাম আলয়-বিজ্ঞান। ঐ জ্ঞান কেবল আত্মাকেই অবলম্বন করিয়া হইয়া থাকে। সৌত্রান্তিকেরা বাহ্য বস্তুকে সত্য ও অনুমানসিদ্ধ কহে। বৈভাষিকদিগের মতে বাহ্যবস্তু সকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ। একমাত্র ভগবান্ বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেষ্টা হইলেও শিষ্যদিগের মতভেদ অসম্ভাবিত নহে। যদ্যপি কোন ব্যক্তি কহে সূর্য্য অস্তগত হইলেন; তাহা হইলে ঐ বাক্য শ্রবণে লম্পট ব্যক্তি পরদারহরণের ও তস্কর পরধনাপহরণের কাল উপস্থিত বোধ করে, এবং সাধুগণ সন্ধ্যাবন্দনাদির সময় হইয়াছে বিবেচনা করেন। অতএব এক ব্যক্তি বক্তা হইলেও শ্রোতৃবর্গ স্ব স্ব অভিপ্রায়ানুসারে এক বাক্যের পৃথক্ পৃথক্ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া থাকে। বাক্, পাণি, পাদ, গুহ্য ও লিঙ্গ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্ ও শ্রোত্র এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; আর মন ও বুদ্ধি এই দুই উভয়েন্দ্রিয়; এই দ্বাদশ ইন্দ্রিয়ের আয়তন বলিয়া দেহকে দ্বাদশায়তন কহে। সকল বৌদ্ধমতেই, ধনোপার্জ্জন দ্বারা এই দ্বাদশায়তন শরীরের সম্যক্ শুশ্রূষারূপ পূজা করাই প্রধান কর্ম্ম। ইহাদিগের মতে দেবতা সুগত, জগৎ ক্ষণভঙ্গুর, প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুই প্রমাণ; এবং দুঃখ, আয়তন, সমুদয় ও মার্গ এই চারি তত্ত্ব। বিজ্ঞানস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও রূপস্কন্ধ এই পঞ্চ স্কন্ধকে দুঃখতত্ত্ব কহে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচ বিষয়, এবং মন ও ধর্ম্মায়তন অর্থাৎ বুদ্ধি এই দ্বাদশটি আয়তন তত্ত্ব। মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণে স্বভাবতঃ যে রাগদ্বেষাদি জন্মে তাহাকে সমুদয় তত্ত্ব কহে। এবং সকল সংস্কারই ক্ষণমাত্রস্থায়ী এইরূপ যে স্থির বাসনা তাহার

নাম মার্গতত্ত্ব। এই মার্গতত্ত্বই মোক্ষ। চর্ম্মাসন, কমণ্ডলু, মুণ্ডন, চীর, পূর্ব্বাহ্নভোজন, সমূহাবস্থান ও রক্তাম্বর এই কয়েকটি বৌদ্ধদিগের যতিধর্ম্মের অঙ্গ।

আর্হত দর্শন।

আর্হতেরা দিগম্বর। তাহারা বৌদ্ধদিগের ক্ষণিকতামত * খণ্ডন করিয়াছে। দিগম্বর আর্হতগণ কহে, যদি প্রতিশরীরে এক এক আত্মা নিরন্তর অবস্থান না করে, তাহা হইলে ঐহিক ফল সাধনের নিমিত্ত কৃষি বাণিজ্যাদি কর্ম্মে কোন মতেই লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ আপনার ফলভোগের নিমিত্তই সকলে উপায়ানুষ্ঠান করে; যদি উপায়ানুষ্ঠানকর্ত্তা যে আত্মা সে ফলভোগকালে উপস্থিত না থাকে, তবে একের ফলভোগের নিমিত্ত অপরের প্রবৃত্তি কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে। আমি কৃষি বাণিজ্যাদি করিয়াছিলাম, আমিই তাহার ফল ভোগ করিতেছি, সকল লোকেরই এই অনুভব হইয়া থাকে, সুতরাং আত্মাকে চিরস্থায়ী বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। আর্হত মতে জীবের পরিমাণ দেহসদৃশ, অর্হৎই পরমেশ্বর, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও রাগদ্বেষাদিশূন্য। এই মতে সম্যগ্‌দর্শন, সম্যগ্‌জ্ঞান ও সম্যক্‌চারিত্র এই তিনকে রত্নত্রয় কহে। জিনোক্ত তত্ত্ব বিষয়ে বিপরীত জ্ঞান ও সংশয়াদির নিবারণাদিরূপ সম্যক্‌ শ্রদ্ধাকে সম্যগ্‌দর্শন কহে; এবং

* বৌদ্ধমতে সকল বস্তুই ক্ষণিক অর্থাৎ প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন ও দ্বিতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয় এবং আত্মাও ক্ষণিক ও জ্ঞানস্বরূপ, ক্ষণিক জ্ঞানাতিরিক্ত স্থিরতর আত্মা নাই।

সংক্ষেপে অথবা বিস্তারিতরূপে জিনোক্ত তত্ত্বের যে জ্ঞান, তাহাকে সম্যগ্‌জ্ঞান কহে। নিন্দিত কর্ম্ম ত্যাগকে সম্যক্‌-চারিত্র বলে। ঐ চারিত্র পাঁচ প্রকার; অহিংসা, অস্তেয়, সূনৃত, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ। কি স্থাবর কি জঙ্গম কোন প্রকার জীবের বিনাশ না করাই অহিংসা, দত্তাতিরিক্ত বস্তুর অগ্রহণ অস্তেয়, সত্য ও হিতকর অথচ প্রিয় ঈদৃশ বাক্যের কথন সূনৃত, কাম ক্রোধাদি পরিত্যাগ ব্রহ্মচর্য্য এবং সকল বিষয়ে মোহত্যাগ অপরিগ্রহ। এই পাঁচটি মহাব্রত, ইহার সাধনাতে পরম পদ প্রাপ্তি হয়।

আর্হতদিগের মধ্যে মতের অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন মতে কহে, তত্ত্ব দুইটি জীব ও অজীব। জীব বোধাত্মক, অজীব অবোধাত্মক। কোন মতে পঞ্চ তত্ত্ব, কোন মতে সপ্ত তত্ত্ব এবং কোন কোন মতে নব তত্ত্বও কহিয়া থাকে। আর্হত-দিগের মধ্যে আর এক সম্প্রদায় আছে। ঐ সম্প্রদায়কে জৈন কহে। জৈনেরা জিনোক্ততত্ত্বের অনুবর্ত্তী হইয়া চলে। জৈন-দিগের মধ্যে যাঁহারা সাধু, তাঁহাদিগের লক্ষণ এই, তাঁহারা ভিক্ষালব্ধ অন্নমাত্র ভক্ষণ করেন, শুক্ল বস্ত্র পরিধান করেন ও লুঞ্চিত কেশ ধারণ করেন, এবং তাঁহারা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও নিঃসঙ্গ। জিনর্ষিরা বস্ত্র গ্রহণ করেন না, লুঞ্চিত কেশ রাখেন, হস্তে পিচ্ছিকা ধারণ করিয়া থাকেন, এবং চলিবার সময় জীবহত্যার ভয়ে পিচ্ছিকা দ্বারা অগ্রে পথ হইতে জীব সকল অপসারিত করিয়া পশ্চাৎ পাদ প্রক্ষেপ করেন, জলপাত্র ব্যবহার করেন না, হস্ত দ্বারাই জল পান করিয়া থাকেন, একাকী আহার করেন না, এবং স্ত্রীসম্ভোগে একান্ত বিরত।

রামানুজ দর্শন।

এই দর্শনে আর্হত মত খণ্ডিত হইয়াছে। রামানুজ কহেন আর্হত মত অতি অপ্রামাণিক ও অশ্রদ্ধেয়, ঐ মত গ্রহণে লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না; যে হেতু উহাতে পঞ্চ-তত্ত্ব সপ্ততত্ত্ব ও নবতত্ত্বাদি নানা বিষয় প্রকটিত হইয়াছে; সুতরাং প্রথমতঃ সকল লোকের এই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, সপ্ততত্ত্ব কি পঞ্চতত্ত্ব কি নবতত্ত্ব কোন্ তত্ত্বের উপর নির্ভর করিব; পরে, অব্যবস্থিত মতাবলম্বনেরই বা আবশ্যকতা কি? এই বলিয়া সকলেই নিবৃত্ত হয়, না হইবে বা কেন? সন্দিগ্ধ বিষয়ে কোন্ ব্যক্তির প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে! ফলতঃ আর্হতমত-প্রবর্ত্তক এই সমস্ত অব্যবস্থিত বিষয় কহিয়া আপনার অব্যবস্থিতচিত্তত্বমাত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। আর্হত মতে লিখিত আছে, যে দেহের পরিমাণানুরূপ জীবের পরিমাণ। কিন্তু ইহা কোন ক্রমেই বিবেচনাসিদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না; দেখ দেহের পরিমাণানুরূপ জীবের পরিমাণ হইলে ঘটাদি জড় বস্তুর ন্যায় জীবও পরিমিত হইত। পরিমিত বস্তু কখনই এক কালে নানা স্থানে থাকে না, সুতরাং জীবেরও এককালে নানা দেশে থাকা অসম্ভব। কিন্তু শাস্ত্রে কথিত আছে যে, যোগীরা যোগবলে কায়ব্যূহ রচনা করিয়া একদাই নানা শরীরে অবস্থিতি

করেন, ঐ মতে ইহা কোন ক্রমেই সম্ভবে না, কারণ যোগীরাও জীব, তাঁহারদিগেরই বা কি প্রকারে এককালে নানা শরীরে অবস্থিতি হইতে পারে। ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে যে স্বকৃত কর্ম্ম বশতঃ মনুষ্যজীবকেও জন্মান্তরে গজ পিপীলিকাদি দেহ ধারণ করিতে হয়, ইহাই বা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে; কারণ মনুষ্যদেহপরিমিত মনুষ্যজীব কখনই বৃহদ্‌গজশরীরকে ব্যাপিয়া থাকিতে পারে না এবং যেমত ক্ষুদ্র ভাণ্ডে জলাশয়স্থ সকল জলের ও কুটীরে করিবরের সমাবেশ হয় না, সেইরূপ অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকাদেহে কোন ক্রমেই তাদৃশ মনুষ্য-জীবের সমাবেশ হইতে পারে না।

এস্থলে এরূপ সম্ভাবনা করিও না যে, যেমন দীপের আ-লোক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গৃহ উভয়ত্রই পরিমিত হইয়া থাকে, সেই-রূপ জীবেরও সঙ্কোচ এবং বিকাসভাবে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল শরীরেই সমাবেশ হইতে পারে। দেখ তাহা হইলে জীব অনিত্য হইয়া উঠে, কারণ যাহার সঙ্কোচ-বিকাসভাব আছে তাহার বিকারও আছে, বিকারী হইলেই অনিত্য হয় ইহারও দৃষ্টান্ত দীপের আলোক। জীবের অনিত্যতাও স্বীকার করা যাইতে পারে না; কারণ জীব অনিত্য হইলে, কৃতপ্রণাশ ও অকৃতাভ্যাগম এই দুই দোষ ঘটিয়া উঠে। দেখ যে ব্যক্তি যে কর্ম্ম করিয়াছে তাহাকে অবশ্যই সেই কর্ম্মের ফল স্বরূপ সুখ বা দুঃখ ভোগ করিতে হয়, অভুক্ত-কর্ম্মের কোন কালেই বিনাশ হয় না। জীবাত্মা অনিত্য হইলে, তাহার বিনাশও স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলেই জীবাত্মার স্বকৃতকর্ম্মের ভোগ না হইয়াই বিনাশ হইল। সুতরাং ভোক্তার অভাবে তাহার সেই কর্ম্মও অভুক্ত

হইয়াই বিনষ্ট হইল। তাহা হইলেই কৃতপ্রণাশ দোষ ঘটিয়া উঠিল, যেহেতু অভুক্তকর্ম্মের প্রণাশকেই কৃতপ্রণাশ কহে। এবং যে ব্যক্তি পুণ্য কর্ম্ম বা পাপ কর্ম্ম কিছুই করেনাই তাহাকে কখনই তত্তৎ কর্ম্মের ফলস্বরূপ সুখ বা দুঃখ কিছুই ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু জীবাত্মার অনিত্যতা স্বীকার করিতে হইলে অকৃতকর্ম্মের ফলভোগরূপ অকৃতাভ্যাগম স্বীকার করিতে হয়। নতুবা এই মতে অভিনবজাত কুমারের সুখ বা দুঃখ কিছুই হইতে পারে না; কারণ তৎকালে তাহার পুণ্য কর্ম্ম বা পাপ কর্ম্ম কিছুই নাই। কিন্তু জীবাত্মার নিত্যতা স্বীকার করিলে এইরূপ দোষ ঘটে না; যেহেতু বাল্যাবস্থায় পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্য বা পাপের ফলস্বরূপ সুখ বা দুঃখের ভোগ হয় ইহা জীবাত্মার নিত্যতামতে অনায়াসেই স্বীকার করা যাইতে পারে, অতএব জীব কখনই দেহপরিমিত নহে সন্দেহ নাই। এই রূপে যখন আর্হত মতের প্রধানভূত জীবপদার্থনির্ণয় দোষপূর্ণ ও ভ্রান্তিসঙ্কুল প্রতিপন্ন হইতেছে তখন ঐ দর্শনের অন্যত্র ভ্রম ও দোষ নাই ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে।

অদ্বৈতমতপ্রবর্ত্তক শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বীরা কহেন একমাত্র ব্রহ্মই সত্য এবং শ্রুতিপ্রতিপাদ্য। জগৎপ্রপঞ্চ কিছুই সত্য নহে সকলই মিথ্যা। যেমত ভ্রমবশতঃ রজ্জুতে মিথ্যাসর্প কল্পিত হইয়া থাকে এবং রজ্জু বলিয়া নিশ্চয় হইলে ভ্রম নিবারণ হইয়া ঐ কল্পিত সর্পেরও নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ অবিদ্যা দ্বারা এই জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মে কল্পিত হইতেছে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই ঐ অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া জগৎপ্রপঞ্চেরও নিবৃত্তি হইবে। অবিদ্যা ভাব পদার্থ; কিন্তু সৎ বা অসৎ পদের বাচ্য

হইতে পারে না বলিয়া উহাকে সদসদনির্ব্বচনীয় কহে, বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে ঐ অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। কিন্তু এই বিষয়ে যে উপনিষদ্‌বাক্য ও অনুভব প্রমাণ রূপে অদ্বৈত-মতাবলম্বীরা উদ্ধৃত করিয়াছেন তদ্দ্বারা উল্লিখিত ভাবস্বরূপ অবিদ্যা সিদ্ধ হইতে পারে না; কারণ শ্রুতিতে যে অনৃত শব্দ আছে, তাহার অর্থ সাংসারিক অল্পফলজনক কর্ম্ম, এবং যে মায়া শব্দ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার অর্থ বিচিত্রসৃষ্টিজনক ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি। সুতরাং ঐ ঐ শ্রুতির দ্বারা অবিদ্যা সিদ্ধ হইল না। এবং "আমি জানিনা" ঈদৃশ অনুভব দ্বারাও উক্ত ভাবরূপ অবিদ্যা সিদ্ধ হইতে পারে না, কারণ "আমি জানি না" এই অনুভব দ্বারা জ্ঞানাভাবেরই বোধ হইয়া থাকে ভাবরূপ অবিদ্যার বোধ হয় না। আর উহাকে যুক্তিসিদ্ধ বলিয়াও অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না; কারণ ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং কি রূপে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া অবিদ্যারূপ অজ্ঞান থাকিবে; আলোককে আশ্রয় করিয়া কি অন্ধকার থাকিতে পারে?। অতএব ভাবরূপ অবিদ্যা পদার্থ যে অলীক ও যুক্তিবিরুদ্ধ তাহাতে সন্দেহ কি?। এইরূপে যখন শাঙ্করমতে যুক্তিবিরুদ্ধ বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে তখন উহা কোন মতেই বিজ্ঞগণের আদরণীয় ও গ্রাহ্য হইতে পারে না।

পদার্থ তিন প্রকার; চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। চিৎ জীব-পদবাচ্য, ভোক্তা, অসঙ্কুচিত, অপরিচ্ছিন্ন, নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ ও নিত্য, এবং অনাদি কর্ম্মরূপ অবিদ্যা বেষ্টিত; ভগব-দারাধনা ও তৎপদ প্রাপ্ত্যাদি জীবের স্বভাব। কেশাগ্রকে শত ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার একাংশকে পুনর্ব্বার

শতাংশ করিলে যেমত সূক্ষ্ম হয়, জীব সেইরূপ সূক্ষ্ম। অচিৎ ভোগ্য ও দৃশ্যপদবাচ্য, অচেতনস্বরূপ, জড়াত্মক জগৎ, এবং ভোগ্যত্ব-বিকারাস্পদত্বাদিস্বভাবশালী। ঐ অচিৎ পদার্থ তিন প্রকার; ভোগ্য, ভোগোপকরণ ও ভোগায়তন। যাহাকে ভোগ করা যায়, তাহাকে ভোগ্য কহে, যেমত অন্ন পানীয়াদি; যাহার দ্বারা ভোগ করা যায়, তাহাকে ভোগোপকরণ কহে, যথা ভোজন-পাত্রাদি; এবং যাহাতে ভোগ করা যায় তাহাকে ভোগায়তন কহে, যথা শরীরাদি। ঈশ্বর সকলের নিয়ামক, হরি-পদবাচ্য, জগতের কর্ত্তা, উপাদান, সকলের অন্তর্যামী, এবং অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, শক্তি, তেজঃ প্রভৃতি গুণাস্পদতারূপ স্বভাবশালী। চিৎ অচিৎ সমুদায় বস্তুই তাঁহার শরীর স্বরূপ। এবং পুরুষোত্তম বাসুদেবাদি তাঁহার সংজ্ঞা। তিনি পরমকারুণিক এবং ভক্তবৎসল, উপাসকদিগকে যথোচিত ফল প্রদান করিবার আশয়ে লীলা বশতঃ পাঁচ প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করেন। প্রথম অর্চ্চা অর্থাৎ প্রতিমাদি। দ্বিতীয় রামাদ্যবতারস্বরূপ বিভব। তৃতীয় "বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, ও অনিরুদ্ধ," এই চারি সংজ্ঞাক্রান্ত ব্যূহ। চতুর্থ সূক্ষ্ম, ও সংপূর্ণ ষড়্‌গুণ বাসুদেব নামক পরব্রহ্ম। পঞ্চম অন্তর্যামী সকল জীবের নিয়ন্তা। এই পাঁচ মূর্ত্তির মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বের উপাসনা দ্বারা পাপ ক্ষয় হইলে উত্তরোত্তরের উপাসনাতে অধিকার জন্মে। অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগ-ভেদে ভগবানের উপাসনাও পাঁচ প্রকার। দেবমন্দিরের মার্জ্জন ও অনুলেপন প্রভৃতিকে অভিগমন কহে, এবং গন্ধ পুষ্পাদি পূজোপকরণের আয়োজনকে উপাদান, পূজাকে ইজ্যা, অর্থানুসন্ধান পূর্ব্বক

মন্ত্রজপ ও স্তোত্রপাঠ, নাম সংকীর্ত্তন ও তত্ত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রাভ্যাসকে স্বাধ্যায়, এবং দেবতানুসন্ধানকে যোগ কহে। এইরূপ উপাসনাকর্ম্মদ্বারা বিজ্ঞান লাভ হইলে করুণাসিন্ধু ভগবান্ স্বকীয় ভক্তগণকে নিত্যপদ প্রদান করেন; ঐ পদপ্রাপ্তি হইলে ভগবানকে যথার্থ রূপে জানিতে পারাযায় এবং পুনর্জ্জন্মাদি কিছুই হয় না।

চিৎ ও অচিতের সহিত ঈশ্বরের ভেদ অভেদ ও ভেদাভেদ তিনই আছে। দেখ যেমত বিভিন্নস্বভাবশালী পশু ও মনুষ্যাদিগের পরস্পর ভেদ আছে, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত স্বভাব ও স্বরূপের বৈলক্ষণ্য বশতঃ চিদচিতের সহিত ঈশ্বরেরও ভেদ স্বীকার করিতে হইবে। আর যেমত "আমি সুন্দর আমি স্থূল" ইত্যাদি ব্যবহারসিদ্ধ ভৌতিক শরীরের সহিত জীবাত্মার অভেদ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ চিদচিৎ সকল বস্তুই ঈশ্বরের শরীর, সুতরাং শরীরাত্মভাবে চিদচিৎ সকল বস্তুর সহিত ঈশ্বরের অভেদও আছে বলিতে হইবে। আর যেমন এক মাত্র মৃত্তিকাই বিভিন্ন ঘট ও শরাবাদি নানা রূপে অবস্থান করিতেছে বলিয়া ঘটের সহিত মৃত্তিকার ভেদাভেদ প্রতীত হইতেছে, সেই রূপ এক মাত্র পরমেশ্বর চিদচিৎ নানা রূপে বিরাজমান আছেন বলিয়া চিদচিতের সহিত তাঁহার ভেদাভেদও আছে সন্দেহ নাই। যে হেতু ঈশ্বরের আকার স্বরূপ চিদচিতের পরস্পর ভেদ লইয়া এবং ঐ উভয়ের সহিত ঈশ্বরের শরীরাত্মভাবে অভেদ বশতঃ ভেদাভেদ ঘটিতেছে। দেখ যাহার অন্তর্যামী যে হয়, তাহাই তাহার শরীর বলিয়া পরিগণিত হয়, যথা ভৌতিক দেহের অন্তর্যামী জীব বলিয়া ভৌতিক দেহ জীবের শরীর,

সেই রূপ জীবের অন্তর্যামী ঈশ্বর, সুতরাং জীব ঈশ্বরের শরীর বলিতে হইবে। অতএব যেমন "আমি সুন্দর আমি স্থূল" ইত্যাদি ব্যবহার দ্বারা ভৌতিক শরীরে জীবাত্মার শরীরাত্মভাবে অভেদ প্রতীতি হয়, সেইরূপ "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো অর্থাৎ হে শ্বেতকেতো তুমি ঈশ্বর," ইত্যাদি শ্রুতিতেও জীবাত্মা ও ঈশ্বরের শরীরাত্মভাবে অভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ফলতঃ তদ্দ্বারা বাস্তবিক অভেদ-প্রতীতি হয় না। অতএব এই শ্রুতি দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য স্বীকার করা এবং জগৎপ্রপঞ্চকে মিথ্যা বলা যে কেবল মূঢ়তার কর্ম্ম তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি !।

শ্রুতিতে যে স্থানে ঈশ্বরকে নির্গুণ কহিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য, প্রাকৃত জনের ন্যায় রাগ দ্বেষাদি গুণ ঈশ্বরের নাই এই মাত্র। আর যে স্থলে পদার্থের নানাত্ব বিষয় নিষেধ করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বর, চিৎ অচিৎ সমুদায় বস্তুর আত্মা, সুতরাং সকল বস্তুই ঈশ্বরাত্মক, ঈশ্বর হইতে পৃথগ্‌ভূত পদার্থ নাই। এই সমস্ত তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া রামানুজ শারীরিক সূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন। বৌধায়নাচার্য্য মহোপনিষদের মতানুসারে শারীরক সূত্রের এক বৃত্তি করেন, কিন্তু ঐ বৃত্তি নিতান্ত বিস্তৃত, এজন্য রামানুজ ঐ বৃত্তির মতানুসারে সংক্ষেপে ভাষ্য করিয়াছেন।

পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন।

পূর্ণপ্রজ্ঞ, আনন্দতীর্থকৃত ভাষ্যের মতানুসারে নিজ দর্শন সংকলন করিয়াছেন। জীব সূক্ষ্ম ও ঈশ্বরসেবক, বেদ অপৌরুষেয় সিদ্ধার্থবোধক ও স্বতঃ প্রমাণ, প্রত্যক্ষ অনু-

মান ও আগম এই তিন প্রমাণ, এবং প্রপঞ্চ সত্য এই সকল বিষয়ে পূর্ণপ্রজ্ঞ ও রামানুজ উভয়েরই মতের ঐক্য আছে, কিন্তু রামানুজ যে ভেদ অভেদ ও ভেদাভেদ এই তিন তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহা পূর্ণপ্রজ্ঞ স্বীকার করেন না। তিনি কহেন রামানুজ পূর্ব্বোক্ত বিরুদ্ধ তত্ত্ব ত্রয় অঙ্গীকার করিয়া শঙ্করাচার্য্যের মতের প্রতিপোষকতা করিয়াছেন অতএব তাঁহার মত অতি অশ্রদ্ধেয়। আনন্দ তীর্থ শারীরক মীমাংসার যে ভাষ্য করিয়াছেন তাহাতে দৃষ্টিপাত করিলে জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর যে ভেদ আছে তদ্বিষয়ে আর কোন সংশয়ই থাকে না। ঐ ভাষ্যে লিখিত হইয়াছে "স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো," এই শ্রুতির, জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর ভেদ নাই এরূপ তাৎপর্য্য নহে। কিন্তু "তস্য ত্বং" অর্থাৎ "তাঁহার তুমি" এই ষষ্ঠী সমাস দ্বারা উহাতে "জীব, ঈশ্বরের সেবক" এই অর্থই বুঝাইবে। আর এরূপ যোজনা দ্বারা এমত অর্থও বুঝাইতে পারে যে জীব, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। এই মতে দুই তত্ত্ব স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র। তন্মধ্যে ভগবান্ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত অশেষ সদ্‌গুণের আশ্রয় স্বরূপ বিষ্ণুই স্বতন্ত্রতত্ত্ব। এবং জীবগণ অস্বতন্ত্রতত্ত্ব অর্থাৎ ঈশ্বরায়ত্ত। এই রূপে সেব্যসেবক ভাবাবলম্বী ঈশ্বর জীবের পরস্পর ভেদও যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে, যেমন রাজা ও ভৃত্যের পরস্পর ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব যাঁহারা জীব ও ঈশ্বরের অভেদ চিন্তাকে উপাসনা কহিয়াথাকেন এবং সেই উপাসনার অনুষ্ঠান করেন তাঁহাদিগের পরলোকে কিছু মাত্র সুখ লাভ হয় না প্রত্যুত ঘোরতর নরকে পতিত হইতে হয়। দেখ যদি ভৃত্যপদবীস্থ কোন ব্যক্তি রাজপদের অভিলাষ করে

অথবা "আমি রাজা" এই রূপ ব্যক্ত করে তাহা হইলে ভূপতি তাঁহার বিলক্ষণ দণ্ড বিধান করেন, আর যে ব্যক্তি স্বীয় অপকর্ষ দ্যোতন পূর্ব্বক নৃপতির গুণোৎকীর্ত্তন করে, রাজা পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে সমুচিত পারিতোষিক প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব ঈশ্বরের গুণোৎকর্ষাদির সমুৎকীর্ত্তন রূপ সেবা ব্যতিরেকে কোন ক্রমেই অভিলষিত ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই।

এই মতে ঈশ্বরের সেবা তিন প্রকার; অঙ্কন, নামকরণ ও ভজন। তন্মধ্যে অঙ্কনের পদ্ধতিসকল সাকল্যসংহিতাপরিশিষ্টে বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে, এবং উহার অবশ্যকর্ত্তব্যতা তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে প্রতিপাদিত হইয়াছে। নারায়ণের চক্রাদি অস্ত্রের চিহ্ন যাহাতে অঙ্গে চিরকাল বিরাজিত থাকে তপ্তলৌহাদিযন্ত্রের দ্বারা তাহা করিবে, দক্ষিণ হস্তে সুদর্শন চক্রের এবং বামহস্তে শঙ্খের চিহ্ন ধারণ করিবে, যেহেতু ঐ চিহ্ন দর্শনে অনুক্ষণ ভগবানের স্মরণ হইবেক এবং তদ্দ্বারা বাঞ্ছিত ফলেরও সিদ্ধি হইবেক। অঙ্কনের এই সমস্ত প্রক্রিয়া অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে। দ্বিতীয় সেবা নামকরণ। নিজ পুত্রাদির কেশবাদি নাম রাখিবে, তাহা হইলে কথায় কথায় ভগবানের নাম সংকীর্ত্তন হইবে। তৃতীয় সেবা ভজন, এই ভজন ত্রিবিধ; কায়িক, বাচিক ও মানসিক। তন্মধ্যে কায়িক ভজন, তিন প্রকার; দান, পরিত্রাণ ও পরিরক্ষণ। বাচিক চারি প্রকার; সত্য, হিত, প্রিয় ও স্বাধ্যায় অর্থাৎ শাস্ত্রপাঠ। এবং মানসিকও তিন প্রকার; দয়া, স্পৃহা ও শ্রদ্ধা।

যেমন "সম্পূজ্য ব্রাহ্মণং ভক্ত্যা শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণো-

ভবেৎ” এই বাক্য দ্বারা, শূদ্রও ভক্তিসহকারে ব্রাহ্মণের পূজা করিলে ব্রাহ্মণের ন্যায় পবিত্রতাদি গুণবিশিষ্ট হয়, এই অর্থই বুঝায়, সেই রূপ “ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি” এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্মের অভেদ না বুঝাইয়া এই অর্থ বুঝাইবে যে ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞত্বাদি-গুণসম্পন্ন হন। শ্রুতিতে “মায়া, অবিদ্যা, নিয়তি, মোহিনী, প্রকৃতি ও বাসনা,” এই যে ছয়টী শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহার অর্থ ভগবানের ইচ্ছামাত্র অদ্বৈতবাদিদিগের কল্পিত অবিদ্যা নহে। আর যে প্রপঞ্চ শব্দ উক্ত আছে, তাহার অর্থ প্রকৃষ্ট পঞ্চভেদ। সেই পঞ্চ ভেদ এই; যথা জীবেশ্বরভেদ, জড়েশ্বরভেদ, জড়জীবভেদ, ও জীবগণের এবং জড়পদার্থের পরস্পরভেদ। ঐ প্রপঞ্চ সত্য ও অনাদি-সিদ্ধ।

সকল আগমেরই বিষ্ণুর সর্ব্বোৎকর্ষ প্রতিপাদন করা প্রধান উদ্দেশ্য। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটী পুরুষার্থ। তন্মধ্যে মোক্ষই নিত্য, অপর তিন পুরুষার্থ অস্থায়ী। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির প্রধান পুরুষার্থমোক্ষলাভে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কিন্তু ঈশ্বরের প্রসন্নতা ব্যতিরেকে ঐ মোক্ষের প্রাপ্তি হয় না, এবং জ্ঞান ব্যতিরেকে ঐ প্রসন্নতাও সম্পন্ন হয় না। ঐ জ্ঞানশব্দে বিষ্ণুর সর্ব্বোৎকর্ষ-জ্ঞানকে বুঝায়। কেবল মন্দবুদ্ধিরাই জীবপ্রেরক বিষ্ণুকে জীব হইতে পৃথক্ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেনা, কিন্তু সুবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণে বিষ্ণু ও জীবের পরস্পর ভেদ আছে, ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র প্রভৃতি সমুদায় দেবগণই অনিত্য ও ক্ষর শব্দ-

বাচ্য এবং লক্ষ্মী অক্ষর শব্দবাচ্য। ঐ ক্ষরাক্ষর হইতে বিষ্ণু প্রধান, ও স্বাতন্ত্র্য শক্তি বিজ্ঞান সুখাদি গুণ সমূহের আধার-স্বরূপ, অপর সকলেই বিষ্ণুর অধীন। এই সমস্ত সম্যক্ জানিতে পারিলে বিষ্ণুর সহিত সহবাস হয়, সমুদায় দুঃখ দূরে যায় এবং নিত্য সুখের উপভোগ হয়।

শ্রুতিতে লিখিত আছে, এক বস্তুর অর্থাৎ ব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞান হইলে সকল বস্তুকেই জানিতে পারা যায়, ইহার তাৎপর্য্য এই, যেমন গ্রামস্থ প্রধান ব্যক্তিদিগকে জানিতে পারিলে গ্রাম জানা হয় এবং পিতাকে জানিতে পারিলে পুত্র জানা হয়, অর্থাৎ পুত্রকে জানিতে আর অপেক্ষা থাকে না, সেইরূপ এই জগতের প্রধানভূত ও পিতার স্বরূপ যে ব্রহ্ম তাঁহাকে জানিতে পারিলেই সমুদায় জানা হয় অর্থাৎ অন্যকে জানিবার আর অপেক্ষা থাকে না; এই মাত্র, নতুবা এ শ্রুতিদ্বারা বাস্তবিক অভেদ বুঝাইবে না। অদ্বৈত-মতাবলম্বীরা যে ব্যাসকৃত বেদান্তসূত্রের কূটার্থ করিয়া থাকেন, সে কিছু নহে। ঐ সূত্রসকলের মধ্যে কয়েকটী সূত্রের যথাশ্রুত তাৎপর্য্যার্থ লিখিত হইতেছে। যথা, "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্রস্থ "অথ" শব্দের আনন্তর্য্য, অধিকার ও মঙ্গল এই তিন অর্থ। আর "অতঃ" এই শব্দের হেতু অর্থ, ইহা গরুড়-পুরাণে ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে লিখিত আছে। যখন নারায়ণের প্রসন্নতা ব্যতিরেকে মোক্ষ হয় না, এবং তাঁহার জ্ঞান ব্যতিরেকে তাঁহার প্রসন্নতা হয় না, তখন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা ঐ সূত্রের ফলিতার্থ। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রে ব্রহ্মের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। ঐ সূত্রের অর্থ

এই, যাহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার হইয়া থাকে, নিত্য নির্দ্দোষ অশেষসদ্‌গুণাশ্রয় সেই নারায়ণই ব্রহ্ম। তাদৃশ ব্রহ্মে প্রমাণ কি? এই জিজ্ঞাসায় কহিয়াছেন "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" শাস্ত্রসকলই নিরুক্ত ব্রহ্মে প্রমাণ, যেহেতু ব্রহ্মই শাস্ত্রসকলের প্রতিপাদ্য। ঐ সূত্রোক্ত শাস্ত্রশব্দে চারি বেদ, মহাভারত, নারদপঞ্চরাত্র, রামায়ণ এবং ঐ সমস্ত গ্রন্থের প্রতিপোষক গ্রন্থসকল বুঝাইবে। কিরূপে ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যত্ব স্বীকার করা যায়, এই আশঙ্কায় কহিতেছেন, "তত্তু সমন্বয়াৎ" শাস্ত্র সকলের উপক্রমে ও উপসংহারে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হওয়ায় ঐ আশঙ্কার সমন্বয় অর্থাৎ সমাধা হইয়াছে।

আনন্দতীর্থভাষ্যে সমুদায় বিষয় বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে। পূর্ণপ্রজ্ঞ ঐ ভাষ্যের মতানুসারে এই সমস্ত রহস্য উদ্ভাবন করিয়াছেন। পূর্ণপ্রজ্ঞের আর দুই সংজ্ঞা, মধ্যমন্দির ও মধ্ব। পূর্ণপ্রজ্ঞ স্বকীয় মাধ্বভাষ্যে লিখিয়াছেন, তিনি বায়ুর তৃতীয় অবতার, বায়ুর প্রথম অবতার হনুমান্ এবং দ্বিতীয় অবতার ভীম।

নকুলীশপাশুপত দর্শন।

এই দর্শনাবলম্বীরা পরম-কারুণিক মহাদেবকেই পরমেশ্বর এবং জীবগণকে পশু কহে। জীবের অধিপতি বলিয়া পরমেশ্বরকে পশুপতিও বলা যায়, যে কোন বিষয় সম্পাদন করিতে হইলে অস্মদাদির যেমন অন্ততঃ

হস্ত পদাদিরও সহায়তা অবলম্বন করিতে হয়, সেইরূপ অন্য কোন বস্তুর সহায়তা অবলম্বন না করিয়াই জগদীশ্বর জগজ্জাত নির্ম্মাণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে স্বতন্ত্র কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, এবং অস্মদাদির দ্বারা যে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে তাহারও কারণ পরমেশ্বর এই নিমিত্ত তাঁহাকে সর্ব্বকার্য্যের কারণ বলিলেও বলা যায়।

এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন যে, যদি সকল কার্য্যেরই কারণ পরমেশ্বর, তবে এককালেই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালের কার্য্য না হয় কেন? এবং কেনই বা সকল সময় সকল কার্য্য না হয়? যেহেতু কারণস্বরূপ জগদীশ্বর সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছেন, এবং কি নিমিত্তই বা মুক্তিতে ইচ্ছা করিয়া ঘোরতর ক্লেশকর তপঃকরণে, পারলৌকিক সুখাভিলাষে যজ্ঞাদি কর্ম্মে ও সুখস্বচ্ছন্দতাবাঞ্ছা করিয়া ধনোপার্জ্জনাদিতে বুদ্ধিমান্ জনগণের প্রবৃত্তি জন্মে? পরমেশ্বর যাহা করিবেন তাহাই হইবে, চেষ্টা করিয়া তদতিরিক্ত কিছুই করিতে পারিব না, এরূপ বিবেচনা করিয়া বরং নিবৃত্ত হইবারই সম্ভাবনা। কিন্তু এরূপ আপত্তি যে কেবল ভ্রান্তিমূলক, বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তাহা স্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হইবে। পরমেশ্বর স্বেচ্ছাক্রমে যাবৎ বিষয় সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহার যখন যে বিষয়ে ইচ্ছা হয় তখনই সেই বিষয় সম্পাদিত হইয়া থাকে। এক কালে সকল কার্য্য হউক, অথবা সর্ব্বদা সকল কার্য্য হউক, এরূপ পরমেশ্বরের ইচ্ছা হয় না, সুতরাং এককালে তাবৎ কার্য্য বা সর্ব্বদা সকল কার্য্য হইতে পারে না। ঈশ্বরের ঐরূপ ইচ্ছা হইলে অবশ্যই ঐরূপ

হইত সন্দেহ নাই। মুমুক্ষু ব্যক্তি যোগাভ্যাসে, স্বর্গাভিলাষী যজ্ঞাদি কর্ম্মে এবং সাংসারিক সুখেচ্ছু ব্যক্তি ধনোপার্জ্জনাদিতে প্রবৃত্ত হউক এইরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় বলিয়াই ঐ সমস্ত বিষয়ে ঐ সকল ব্যক্তিদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হয়। তাঁহার ইচ্ছা কখনই বৃথা হয় না। পরমেশ্বর সকলের প্রভুস্বরূপ এবং তাঁহার ইচ্ছা আদেশস্বরূপ সুতরাং প্রভুর আদেশ উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া অগত্যা সকলকে ঐ সমস্ত বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ইহা যুক্তি বিরুদ্ধ হইতেছে না, কারণ যদি পরমেশ্বরের ইচ্ছাক্রমেই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, তবে তাঁহার ইচ্ছা হইলে ঐ সমস্ত বিষয়ে ঐ সকল ব্যক্তির প্রবৃত্তিরূপ কার্য্য না হইবে কেন? এইরূপে স্বেচ্ছাক্রমে তাবৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন বলিয়া, ঈশ্বরকে স্বেচ্ছাচারী বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

এই মতে মুক্তি দুই প্রকার, দুঃখসকলের অত্যন্ত নিবৃত্তি ও পারমৈশ্বর্য্য প্রাপ্তি। দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরূপ মুক্তি হইলে, আর কোন কালেই কোন দুঃখ জন্মে না, এজন্য ঐ মুক্তিকে চরমদুঃখনিবৃত্তি কহে। দৃক্‌শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি ভেদে পারমৈশ্বর্য্যমুক্তিও দ্বিবিধ; দৃক্‌শক্তি দ্বারা কোন বিষয় অবিজ্ঞাত থাকেনা, যত সূক্ষ্ম যত ব্যবহিত বা যত দূরস্থ হউকনা কেন; স্থূল অব্যবহিত ও অদূরবর্ত্তী বস্তুর ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয়, এবং যে বস্তুর যে গুণ বা যে দোষ আছে, তাহাও জানা যায়। ফলতঃ সকল বিষয়ই দৃক্‌শক্তিমান্ ব্যক্তির জ্ঞান পথের পথিক হয়। ক্রিয়াশক্তি হইলে যখন যে বিষয়ে অভিলাষ হয়, তখনই তাহা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। ক্রিয়াশক্তি মুক্ত ব্যক্তির কেবল ইচ্ছামাত্র অপেক্ষা করে। মুক্ত ব্যক্তির ইচ্ছা

হইলে, অন্য কোন কারণ অপেক্ষা না করিয়াই অবিলম্বে তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হয়। এইরূপ দৃক্‌শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি-রূপ মুক্তি পরমেশ্বরের তত্তৎ শক্তি সদৃশ, এজন্য উহাকে পারমৈশ্বর্য্য-মুক্তি কহে। পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনে কথিত ভগবদ্দাসত্ব প্রাপ্তিকে মুক্তি বলা উক্তি মাত্র, কারণ মুক্ত ব্যক্তিকে যদ্যপি দাসত্বরূপ অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হইল, তবে তাহাকে কিরূপে মুক্ত বলা যাইতে পারে। দেখ, অমূল্য মণিমাণিক্য-রত্নাদি-বিনির্ম্মিত-শৃঙ্খলা-বদ্ধ ব্যক্তিকেও বদ্ধই কহিয়া থাকে, কেহই তাহাকে মুক্ত কহে না। অতএব অন্ধকে পদ্মলোচন বলার ন্যায়, ভগবদ্দাসত্বরূপ অধীনতাপাশে বদ্ধ ব্যক্তিকে মুক্ত বলা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ ও হাস্যাস্পদ, সন্দেহ নাই।

এই মতে প্রধানধর্ম্মসাধনকে চর্য্যা বিধি কহে। চর্য্যা দুই প্রকার; ব্রত ও দ্বার। ত্রিসন্ধ্য ভস্মম্রক্ষণ, ভস্মশয্যায় শয়ন ও উপহার, এই তিনকে ব্রত কহে। হ হ হা করিয়া হাস্যরূপ হসিত, গান্ধর্ব্বশাস্ত্রানুসারে মহাদেবের গুণগানরূপ গীত, নাট্যশাস্ত্রসম্মত নর্ত্তনরূপ নৃত্য, পুঙ্গবের চীৎকারের ন্যায় চীৎকাররূপ হুডুক্কার, প্রণাম ও জপ এই ছয় কর্ম্মকে উপহার বলে। এরূপ ব্রত জনসমাজে না করিয়া অতি গোপনে সম্পাদন করিতে হয়। দ্বাররূপ চর্য্যা— ক্রাথন, স্পন্দন, মন্দন, শৃঙ্গারণ, অবিতৎকরণ, অবিতদ্ভাষণ ভেদে ছয় প্রকার। সুপ্ত না হইয়াও সুপ্তের ন্যায় প্রদর্শনকে ক্রাথন কহে; এবং বায়ুসম্পর্কে কম্পিতের ন্যায় শরীরাদির কম্পনকে স্পন্দন, খঞ্জ ব্যক্তির অনুরূপ গমনকে মন্দন, পরমরূপবতীস্ত্রীসন্দ-র্শনে বাস্তবিক কামুক না হইয়াও কামুকের ন্যায় কুৎসিত ব্যবহারপ্রদর্শনকে শৃঙ্গারণ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য পর্য্যালোচনা পরি-

শূন্যের ন্যায় বিগর্হিত কর্ম্মানুষ্ঠানকে অবিতৎকরণ, এবং নিরর্থক * বা বাধিতার্থক † শব্দোচ্চারণকে অবিতদ্ভাষণ কহে। এই মতে তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাধন। শাস্ত্রান্তরেও তত্ত্বজ্ঞান, মুক্তির সাধন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে বটে, কিন্তু শাস্ত্রান্তর দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া এই শাস্ত্রই মুমুক্ষুগণের একমাত্র অবলম্বনীয়। বিশেষরূপে যাবতীয় বস্তু জানিতে না পারিলে তত্ত্বজ্ঞান হয় না। কিন্তু যাবতীয় বস্তুর বিশেষরূপে জ্ঞান শাস্ত্রান্তর দ্বারা হইবার সম্ভাবনা নাই, যেহেতু শাস্ত্রান্তরে সকল বিষয় বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই; দেখ! শাস্ত্রান্তরে কেবল দুঃখনিবৃত্তিকেই মুক্তি কহিয়াছে; আর যোগের ফল কেবল দুঃখনিবৃত্তি, কার্য্যজাত অনিত্য এবং কারণস্বরূপ পরমেশ্বর কর্ম্মাদিসাপেক্ষ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু এই শাস্ত্রে পারমৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তি এই উভয়ইরূপ মুক্তি, এবং ঐ উভয়ই যোগের ফল, কার্য্য সকল নিত্য এবং পরমেশ্বর স্বতন্ত্র কর্ত্তা, এইরূপ অনেক অধিক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব এই শাস্ত্র যে শাস্ত্রান্তর হইতে উত্তম তাহাতে আর সন্দেহ কি? ‡

* যথা জড়বজ্জড়াং ইত্যাদি।

† যথা সূর্য্য আকাশ হইতে আমার বাটীতে পতিত হইয়াছেন ইত্যাদি।

‡ এস্থানে মাধবাচার্য্য এমত সংক্ষেপে এই দর্শনের পদার্থনির্ণয়াংশ সন্নিবেশিত করিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা ঐ দর্শনাভিজ্ঞ ব্যতীত কাহারো বিলক্ষণরূপে তাৎপর্য্যার্থ অবগত হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তদনুবর্ত্তী হইয়া তদংশ উদ্ধৃত করিলে অস্মদাদির নিরর্থক বাগাড়ম্বর মাত্র হয়। কিন্তু বাহুল্যরূপে নির্দ্দেশ করাও বিবেচনাসিদ্ধ হইতেছে না, কারণ তাহা হইলে ঐ অংশই এক খানি পুস্তক হইয়া উঠে এবং প্রকৃত বিষয়ের সহিত তাদৃশ সম্পর্ক থাকে না এজন্য এস্থলে ঐ অংশ এক কালে পরিত্যাগ করা গেল।

শৈব দর্শন

এই দর্শনেও ভক্তবৎসল শিবদেবতাই পরমেশ্বর ও জীবগণ পশু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্ব মতে পরমেশ্বরের কর্ম্মাদিনিরপেক্ষ কর্ত্তৃত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এতন্মতাবলম্বীরা তাহা স্বীকার না করিয়া, যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, পরমেশ্বর তাহাকে তদনুরূপ ফল প্রদান করিতেছেন বলিয়া পরমেশ্বরকে কর্ম্মাদিসাপেক্ষ কর্ত্তা কহে। ইহা যুক্তি-সিদ্ধও হইতেছে; দেখ যদি কেবল পরমেশ্বরের ইচ্ছাক্রমেই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হইত, তবে জগদীশ্বর অস্মদাদির আহার বিহারাদির উপায়স্বরূপ হস্ত পদাদির সৃষ্টি করিবেন কেন! নানাবিধ ভোজনীয় দ্রব্যাদিরই বা সর্জ্জন করিবার প্রয়োজন কি! তাঁহার ইচ্ছা হইলেই ত ভোজনাদি যাবতীয় কর্ম্ম অনায়াসে সুসম্পন্ন হইতে পারিত। এবং যখন দেখা যাইতেছে, কেহ অট্টালিকায় দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় শয়ন করিতেছেন, কেহ বা তরুতলে তৃণশয্যান্বেষণে ব্যগ্র হইতেছেন, কেহ অমৃততুল্য সুস্বাদু দ্রব্য ভোজন করিয়া তাদৃশ দ্রব্যকেও সামান্য দ্রব্যের ন্যায় প্রত্যাখ্যান করিতেছেন, কেহ বা অন্নাভাবে জঠরানলে দগ্ধ হইয়া দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষাপ্রার্থনায় ব্যগ্র হইতেছেন, কেহ নৃত্যগীতাদি প্রমোদে পরমানন্দে কাল যাপন করিতেছেন, কেহবা পুত্র-

দারাদিশোকে ব্যাকুল বা অসহ্য পীড়ায় পীড়িত হইয়া অতি কষ্টে সময়াতিপাত করিতেছেন, তখন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তত্তৎ ব্যক্তির বিসদৃশ ফলভোগের কারণ কেবল উহাদিগের পূর্ব্বকৃত সুকৃত ও দুষ্কৃত, নতুবা কখনই এমত ঘটনা ঘটিতে পারে না। দেখ জগদীশ্বর সকলেরই পিতাস্বরূপ এবং হিতৈষী। তাঁহার স্নেহের ন্যূনাধিকভাব কুত্রাপি নাই এবং কাহার সুখ বা কাহার দুঃখ হউক এমত তাঁহার অভিপ্রায়ও নহে। যদি কেবল তাঁহার ইচ্ছাক্রমেই সকলের সুখ হইত, তবে সকলেই সুখী হইত এবং বন্ধ্যার পুত্রের ন্যায় দুঃখ পদার্থ অলীক হইয়া উঠিত। অতএব যাহার যেরূপ কর্ম্ম পরমেশ্বর তাহাকে তদনুরূপ ফলভোগে নিযুক্ত করেন বলিয়া পরমেশ্বর যে কর্ম্মাদিসাপেক্ষ কর্ত্তা তাহার সন্দেহ কি।

কিন্তু ইহাতে এমত সম্ভাবনা করিও না যে, তবে পরমেশ্বরের স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব রহিল না। যেমত পৃথিবী-শ্বরদিগের পৃথ্বী রক্ষণাবেক্ষণে নিজ অমাত্যবর্গের সহায়তা অবলম্বনেও স্বাধীনতার ব্যাঘাত হয় না, সেইরূপ জগ-দীশ্বরের কর্ম্মাদিসাপেক্ষতায় স্বতন্ত্রতার কোন হানি হয় না। অন্যকর্ত্তৃক আদিষ্ট না হইয়া যিনি যে বিষয় সম্পাদন করেন, তাঁহার সে বিষয়ে স্বতন্ত্রকর্ত্তৃতা থাকে। যখন পরমেশ্বর কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক আদিষ্ট না হইয়াই জগন্নির্ম্মাণ করিতেছেন, তখন অবশ্যই পরমেশ্বরের জগ-ন্নির্ম্মাণে স্বতন্ত্রকর্ত্তৃতা আছে, সন্দেহ নাই। অস্মদাদিভিন্ন যে এক জন পরমেশ্বর আছেন তাহা অনুমান-সিদ্ধ। অনু-মানের প্রণালী এইরূপ, যে বস্তুর আকার আছে, তাহা

অনিত্য ও কার্য্য, আর যে যে বস্তু কার্য্য হয়, সে সকলই সকর্ত্তৃক হয়, অর্থাৎ তাহার এক জন কর্ত্তা থাকে, যেমত বস্ত্র ও ভূষণাদি। এমত কোন বস্ত্র বা ভূষণাদি দৃষ্টিগোচর হয় না, যাহা কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক নির্ম্মিত নহে। কর্ত্তৃতা সচেতন ব্যতিরেকে কখনই অচেতনের সম্ভবে না। দেখ তুরী তন্তু প্রভৃতি সকলেই বস্ত্রের কারণ বটে, কিন্তু বস্ত্রের কর্ত্তৃতা তন্ত্রবায়ভিন্ন আর কাহারও নাই; ইহাতেই বিবেচনা হয় যে, যখন জগতের আকার দৃষ্ট হইতেছে, তখন জগৎ অবশ্যই অনিত্য ও কার্য্য সন্দেহ নাই। এবং জগৎ যদি কার্য্য হইল, তবে উহার এক জন কর্ত্তা আছেন ইহাও অঙ্গীকার করিতে হইবে; কিন্তু তদ্বিষয়ে অস্মদাদির কর্ত্তৃত্ব সম্ভবে না, যেহেতু জগদন্তর্গত অগম্য নিবিড় অরণ্যস্থ বৃক্ষাদি নির্ম্মাণে অস্মদাদির কর্ত্তৃতা নাই, সুতরাং অস্মদাদি-ভিন্ন যে এক জন জগন্নির্ম্মাণনিপুণ সচেতন পরাৎ-পর পরমেশ্বর আছেন তাহার সন্দেহ কি। এবং পর-মেশ্বর যে সর্ব্বজ্ঞ ইহাও অসম্ভাবিত নহে। দেখ যে ব্যক্তি যে বস্তু না জানে, কখনই তাহা হইতে সে বিষয় সম্পন্ন হয় না। যখন পরমেশ্বর সকল বিষয় সম্পাদন করিতেছেন, তখন তিনি যে সকল বিষয় জানেন না ইহা কাহার বিশ্বাসা-স্পদ হইবে?

যেমত ঘটাদিকার্য্যের কর্ত্তৃত্ব শরীরীব্যতিরেকে অশরীরীর সম্ভবে না, তদ্রূপ জগৎকার্য্যের কর্ত্তৃত্বও অশরীরী পর-মেশ্বরের হইতে পারে না; এ জন্য তাঁহার শরীর স্বীকার করিলে পরমেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা অপরিমিত শক্তি ও ক্লেশবৈধুর্য্যাদি-গুণাস্পদতার ভঙ্গ হইয়া উঠে, যে হেতু ঐ

সমস্ত গুণ শরীরীকে সংস্পর্শও করে না, সুতরাং অশরীরী ঈশ্বরকে জগৎকর্ত্তা বলা যাইতে পারে না, এরূপ আপত্তি কেবল জিগীষার কার্য্য বলিতে হইবে; কারণ এমত কিছুই নিয়ম নাই যে, শরীরীব্যতিরেকে অশরীরী কর্ত্তা হয় না; যে হেতু নিজ শরীর সঞ্চালনাদিতে অশরীরী জীবাত্মারও কর্ত্তৃত্ব দৃষ্ট হইতেছে। এবং যাহার প্রাকৃত শরীর, তাহার সর্ব্বজ্ঞতা থাকে না এই মাত্র নিয়ম আছে, নতুবা এমত কিছু নিয়ম নাই যে, শরীরী মাত্রেই অসর্ব্বজ্ঞ, পরিমিতশক্তিশালী ও ক্লেশভাগী। অস্মদাদির ন্যায় পরমেশ্বরের প্রাকৃত শরীর নহে, পঞ্চমন্ত্রাত্মক শক্তিই তাঁহার শরীর। ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব ও সদ্যোজাত, এই পাঁচটি মন্ত্র যথাক্রমে ঈশ্বরের মস্তক, বদন, হৃদয়, গুহ্য ও পাদস্বরূপ, এবং যথাক্রমে অনুগ্রহ, তিরোভাব, প্রলয়, স্থিতি ও সৃষ্টিরূপ পঞ্চ কৃত্যেরও কারণ। এই পাঁচটি মন্ত্র বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে। যদিও "পঞ্চবক্ত্র স্ত্রিপঞ্চদৃক্" (অর্থাৎ ঈশ্বরের পঞ্চ বদন ও পঞ্চদশ নয়ন) ইত্যাদি আগম দ্বারা আপাততঃ বোধ হয় যে, অস্মদাদির ন্যায় ঈশ্বরেরও নয়নাদিবিশিষ্ট প্রাকৃত শরীর, কিন্তু উহা বাস্তবিক নহে। ঐ সকল আগমের তাৎপর্য্য এই যে, নিরাকার বস্তুর চিন্তাস্বরূপ ধ্যান হইতে পারে না বলিয়া ভক্তবৎসল পরমেশ্বর ভক্ত দিগের ঐ সকল কার্য্য সম্পাদনার্থ করুণা করিয়া কখন কখন তাদৃশ আকার ধারণ করেন।

পতি, পশু ও পাশ ভেদে পদার্থ তিন প্রকার; পতি পদার্থ ভগবান্ শিব, এবং যাঁহারা শিবত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা, আর শিবত্বপদপ্রাপ্তিসাধন দীক্ষাদি উপায় সকল। পশু

পদার্থ জীবাত্মা। ঐ জীবাত্মা মহৎ, ক্ষেত্রজ্ঞাদিপদবাচ্য, দেহাদিভিন্ন, সর্ব্বব্যাপক, নিত্য, অপরিচ্ছিন্ন, দুর্জ্ঞেয় ও কর্ত্তা স্বরূপ। চার্ব্বাক মতাবলম্বীরা কহেন, দেহই জীবাত্মা, দেহাতিরিক্ত জীবাত্মাতে কোন প্রমাণ নাই; কিন্তু এই কথা স্থূলদর্শী বালক দিগের বাক্যের ন্যায় অগ্রাহ্য ও হাস্যাস্পদ। কারণ তাহা হইলে বাল্য কালে দৃষ্ট বস্তুর যৌবনাবস্থায় স্মৃতি হইতে পারে না। দেখ বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য অবস্থাভেদে দেহও ভিন্ন ভিন্ন হইতেছে, সুতরাং দেহকে আত্মা বলিলে ঐ ঐ অবস্থাভেদে আত্মারও ভেদ স্বীকার করিতে হইবে, আর যে বিষয় পূর্ব্বে জ্ঞাত না থাকে, তাহা কখনই স্মৃতিপথারূঢ় হয় না, পূর্ব্ব জ্ঞাত বস্তুরই স্মৃতি হইয়া থাকে; অতএব যেমত এক ব্যক্তির দৃষ্ট বস্তু অন্য ব্যক্তির স্মৃতিরূঢ় হয় না, সেই রূপ বাল্যাবস্থায় দৃষ্ট বস্তুর যৌবনাবস্থায় স্মৃতি হওয়া অসম্ভাবিত। কিন্তু জীব নিত্য হইলে এ তিন অবস্থাতেই এক জীবের এক কালে দর্শন ও কালান্তরে স্মরণ হইবার বাধা নাই। অতএব আত্মা যে দেহাতিরিক্ত ও চিরস্থায়ী তাহাতে সন্দেহ কি। ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে, আত্মাকে ক্ষণিক অর্থাৎ প্রতিক্ষণে ভিন্ন বলা বৌদ্ধ দিগের অপলাপ ও বৃথা বাগাড়ম্বর মাত্র। আরও দেখ, যেমত (এই স্থান বা এই কাল পর্য্যন্ত আকাশ আছে, এই রূপ নির্দ্দেশ করিয়া) দেশ কালের দ্বারা আকাশের পরিচ্ছেদ করা যায় না বলিয়া উহার নিত্যতা ও পরমমহত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই রূপ দেশ কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন আত্মারও নিত্যতা ও পরমমহত্ত্ব স্বীকার করিতে হইবে। এই রূপে যখন জীবাত্মার পরমমহত্ত্ব সিদ্ধি হইতেছে এবং

আকাশের ন্যায় পরমমহৎ হইলেই সর্ব্বব্যাপক হয় এই রূপ নিয়ম আছে, তখন জীবাত্মার অব্যাপকতা স্বীকার করা যে জৈনদিগের ভ্রান্তিমূলক তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি? এ স্থলে নৈয়ায়িকেরা কহেন যে "আমি সুখী আমি দুঃখী এই রূপ আত্মবিষয়ক জ্ঞান হয় বলিয়া আত্মাকে মেয়রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।" কিন্তু ইহাও যুক্তি বিরুদ্ধ হইতেছে; দেখ যে বস্তু মেয় হয়, তাহার মাতা অর্থাৎ তদ্বিষয়ের জ্ঞাতা তদতিরিক্ত এক জন থাকে; যেমন মেয়স্বরূপ জড় বস্তুর মাতা জীবাত্মা, সেই রূপ জীবাত্মা মেয় হইলে সুতরাং তদতিরিক্তকে তাহার মাতা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এবং জীবাত্মার মাতা মেয় হইলে তাহারও এক জন মাতা স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে নৈয়ায়িক মতে অনবস্থা ঘটিয়া উঠে। আর সাংখ্য দর্শনে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, জীবের কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া জীব অকর্ত্তা; কিন্তু উহাও অগ্রাহ্য ও অপ্রামাণিক। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, বক্ষ্যমাণ পাশজাল হইতে মুক্ত হইতে পারিলে জীব ও দৃক্‌চৈতন্য এবং ক্রিয়াচৈতন্য স্বরূপ শিবত্ব লাভ করিয়া সকল বিষয় দর্শন ও নির্ম্মাণ করিতে পারেন; বোধ হয় সাংখ্যমতানুসারীরা সেই সমস্ত শাস্ত্রে দৃষ্টি পাত করেন নাই, নতুবা কেন এমন কথা কহিবেন।

অদ্বৈতমতাবলম্বীদিগেরও কি অসন্দিগ্ধচিত্ততা ও স্বমতস্থাপনে ব্যগ্রতা! দেখ কেহ সুখ স্বচ্ছন্দতাক্রমে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, কেহ বা অতি কষ্টে কাল যাপন করিতেছে, কেহ অতি তীক্ষ্ণধীশক্তিসম্পন্ন, কেহ বা দক্ষিণ-

হস্ত বামহস্ত জ্ঞান বিহীন, এবং কাহার অত্যন্ত কুটিল স্বভাব, কাহার বা সরল অন্তঃকরণ ; এই রূপ জীব সকলের পরস্পর স্বরূপ ও স্বভাবের বৈলক্ষণ্য প্রত্যক্ষ করিয়া কোন্ ব্যক্তি জীবের নানাত্ব স্বীকার না করিবেন ! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল দর্শন করিয়াও অদ্বৈতমতাবলম্বীদিগের চিত্তে একবার সন্দেহও হয় না যে জীব নানা ; অথবা স্বমতসংস্থাপনব্যগ্রতাই উহাদিগের চিত্ত হইতে সংশয়কে দূরীকৃত করিতেছে, নতুবা উহারা অবশ্যই জীবের নানাত্ব স্বীকার করিত সন্দেহ নাই। পাশপদার্থ মল, কর্ম্ম, মায়া ও রোধশক্তি ভেদে চারি প্রকার। স্বাভাবিক অশুচিকে মল কহে, যেমত তণ্ডুল তুষদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, সেই রূপ ঐ মল দৃক্‌শক্তি ও ক্রিয়াশক্তিকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে। ধর্ম্মাধর্ম্মকে কর্ম্ম, প্রলয়াবস্থায় যাহাতে কার্য্যসকল লীন হয় এবং পুনর্ব্বার সৃষ্টি কালে যাহা হইতে উৎপন্ন হয় তাহাকে মায়া, এবং পুরুষতিরোধায়ক যে পাশ তাহাকে রোধশক্তি কহে। জীবকে পশুপদার্থ কহে। ঐ পশুপদার্থ তিন প্রকার ; বিজ্ঞানাকল, প্রলয়াকল আর সকল। একমাত্র মলস্বরূপ পাশযুক্ত জীবকে বিজ্ঞানাকল কহে, এবং মল ও কর্ম্ম রূপ পাশদ্বয়যুক্তকে প্রলয়াকল, আর মল, কর্ম্ম এবং মায়া এই পাশত্রয়বদ্ধকে সকল কহে। সমাপ্তকলুষ ও অসমাপ্তকলুষভেদে বিজ্ঞানাকল জীবও দ্বিবিধ ; তন্মধ্যে সমাপ্তকলুষ বিজ্ঞানাকল জীবকে পরমেশ্বর অনুগ্রহ করিয়া অনন্ত, সূক্ষ্ম, শিবোত্তম, একনেত্র, একরুদ্র, ত্রিমূর্ত্তিক, শ্রীকণ্ঠ এবং শিখণ্ডী, এই কয়েকটি বিদ্যেশ্বর পদে নিযুক্ত করেন।

আর অসমাপ্তকলুষদিগকে মন্ত্রস্বরূপ করেন। ঐ মন্ত্র সাত কোটি। প্রলয়াকল জীবও দ্বিবিধ; পক্ক পাশ-দ্বয় ও অপক্ক পাশদ্বয়। পক্কপাশদ্বয়ের মুক্তি পদ প্রাপ্তি হয়, অপক্কপাশদ্বয়কে পূর্য্যষ্টক দেহ ধারণ করিয়া স্বকর্ম্মা-নুসারে তির্য্যঙ্মনুষ্যাদি বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তস্বরূপ অন্তঃকরণ; ভোগ-সাধন, কলা, কাল, নিয়তি, বিদ্যা, রাগ, প্রকৃতি ও গুণ এই সপ্ত তত্ত্ব; পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত; এবং ঐ পঞ্চভূতের কারণ স্বরূপ পঞ্চতন্মাত্র চক্ষুঃ, ত্বক্, শ্রোত্র, ঘ্রাণ ও রসনা এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়; সমুদায়ে একত্রিংশত্তত্ত্বাত্মক সূক্ষ্ম দেহকে পূর্য্যষ্টক দেহ কহে। ঐ অপক্কপাশদ্বয় জীবের মধ্যে যাহাদিগের পুণ্যাতিশয় সঞ্চিত আছে, মহেশ্বর অনন্ত তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া পৃথিবীপতিত্ব পদবী প্রদান করেন। সকলস্বরূপ জীবও দ্বিবিধ; পক্ককলুষ আর অপক্ককলুষ। ইহার মধ্যে পক্ক-কলুষ দিগকে মহেশ্বর করুণা করিয়া মন্ত্রেশ্বর পদবী প্রদান করেন। মন্ত্রেশ্বরও মণ্ডল্যাদি ভেদে এক শ আ-ঠার। আর অপক্ককলুষদিগকে মহেশ্বর সংসারকূপে নিঃক্ষেপ করেন।

প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন।

প্রত্যভিজ্ঞামতাবলম্বীরাও ভক্তবৎসল মহেশ্বরকেই জগদীশ্বর বলিয়া থাকেন এবং তুরী তন্তু প্রভৃতি জড়াত্মক বস্তু সকলকে

পটাদি কার্য্যের কারণ না বলিয়া একমাত্র পরমেশ্বর-কেই জগৎ কার্য্যের কারণরূপে নির্দ্দেশ করেন। যেমত তপঃপ্রভাবশালী তাপসগণ ইষ্টক ও চূর্ণ প্রভৃতি লৌকিক-কারণসাপেক্ষ না হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে নিবিড় অরণ্যে অট্টা-লিকা নির্ম্মাণ এবং স্ত্রীসংসর্গ ব্যতিরেকেই মানস পুত্রাদি উৎপাদন করিয়া থাকেন, সেইরূপ জগদীশ্বর মহাদেব জগন্নির্ম্মাণবিষয়ে জড়াত্মক জগদন্তর্গত কোন বস্তুর অপেক্ষা না করিয়া স্বেচ্ছাবশতঃ জগন্নির্ম্মাণ করিতেছেন, পরমেশ্বর ব্যতীত আর কেহই কোন কার্য্যের কারণ নহে। যদি পটাদি কার্য্যের তুরীতন্তুপ্রভৃতি জড় বস্তু কারণ হইত, তবে কখনই তুরীতন্তুপ্রভৃতি না থাকিলে কেবল যোগী-দিগের ইচ্ছাদ্বারা পটাদি কার্য্য হইত না; যেহেতু কারণ না থাকিলে কখনই কার্য্য হয় না এইরূপ নিয়ম আছে; কিন্তু যখন তুরী ও তন্তু প্রভৃতি না থাকিলেও যোগীদিগের ইচ্ছাবশতঃ পটাদি কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, তখন পটাদি কার্য্যের প্রতি তুরীপ্রভৃতি যে বাস্তবিক কারণ নহে তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি। এই জগন্নির্ম্মাণ বিষয়ে জগ-দীশ্বর অন্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিয়োজিত নহেন এবং অন্য কোন বস্তুর সহায়তাও অবলম্বন করেন না, এজন্য তাঁহাকে স্বতন্ত্র বলা যায়। যেমত স্বচ্ছ দর্পণে বদনাদির প্রতিবিম্ব পড়িলে বদনাদি দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ জগদীশ্বরে বস্তুসকলের প্রতিবিম্ব পড়িলে বস্তু সকলের প্রকাশ হয়, এজন্য ঈশ্বরকে জগদ্দর্শনদর্পণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও করা যাইতে পারে। এবং যেমত বহুরূপী ব্যক্তিরা স্বেচ্ছাক্রমে কখন নৃপতি, কখন ভিক্ষুক, কখন স্ত্রী, কখন কুমার,

কখন বা বৃদ্ধ প্রভৃতির রূপ ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ভগবান্ মহেশ্বরও স্থাবর জঙ্গমাদি নানারূপে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিয়া স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক জগৎ নির্ম্মাণ করিতেছেন এবং ঐ ঐ রূপে অবস্থানও করিতেছেন। এজন্য এই জগৎ যে ঈশ্বরাত্মক তাহার আর সন্দেহ কি। পরমেশ্বর আনন্দ-স্বরূপ ও প্রমাতা অর্থাৎ জ্ঞাতা, এবং জ্ঞানস্বরূপ; সুতরাং অস্মদাদির ঘটপটাদিবিষয়ক যে যে জ্ঞান হইতেছে, সে সকলই পরমেশ্বর স্বরূপ।

যদি সকলবস্তুবিষয়ক সকল জ্ঞানই এক মাত্র ঈশ্বর স্বরূপ হয়, তবে ঘটজ্ঞানের সহিত পটজ্ঞানের ভেদ কি রহিল? এইরূপ আপত্তি, বিবেচনা করিলে, উত্থাপিত হইতে পারে না। বাস্তবিক সকলবস্তুবিষয়ক জ্ঞানের ভেদ না থাকি-লেও ঘট পটাদি বিষয়ের ভেদ লইয়া ঘটজ্ঞান হইতে পটজ্ঞান ভিন্ন এইরূপ ব্যবহার হইবার বাধা কি। দেখ, কুণ্ডল ও কটকাদিরূপে পরিণত সুবর্ণের বাস্তবিক ভেদ না থাকিলেও কুণ্ডল ও কটকাদিরূপ উপাধির ভেদে কুণ্ডল হইতে কটকালঙ্কার ভিন্ন এইরূপ সর্ব্বজনসিদ্ধ ব্যবহার হইয়া থাকে।

এই মতে মুক্তিস্বরূপ পরাপরসিদ্ধির উপায় এক মাত্র প্রত্যভিজ্ঞা। অন্য মতের ন্যায় এই মতে পূজা, ধ্যান, জপ, যাগ ও যোগাদির অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই, প্রত্য-ভিজ্ঞা দ্বারাই সমুদায় সিদ্ধ হইতে পারে। "স এবেশ্বরো-ঽহম্" (সেই ঈশ্বরই আমি) এইরূপ পরমেশ্বরের সহিত জীবাত্মার অভেদ জ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা কহে। যেমন, খর্ব্বা-কৃতি ব্যক্তিকে বামন কহে—এইরূপ পূর্ব্ব উপদিষ্ট ব্যক্তির,

খর্ব্বাকৃতি পুরুষ দৃষ্টিগোচর হইলে,' 'সোঽয়ং বামনঃ" (সেই এই বামন) এই রূপ যে জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহাকে নৈয়ায়িকপ্রভৃতিরা প্রত্যভিজ্ঞা কহিয়া থাকেন, সেই রূপ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ও অনুমানাদি দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ ও শক্তি জানিয়া, সেই শক্তি জীবাত্মাতেও আছে—এই রূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে, "সএবে-শ্বরোঽহম্" (সেই ঈশ্বরই আমি) এইরূপ যে জ্ঞান হয়, তাহাকে এতন্মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগের প্রত্যভিজ্ঞা শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা নিতান্ত অমূলক বা স্বকপোলরচিত নহে। এইরূপ নিঃসংশয় প্রত্যভিজ্ঞা শাস্ত্রান্তরদ্বারা সমুৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, এজন্য এই শাস্ত্র যে শাস্ত্রান্তর অপেক্ষা আদরণীয় এবং শ্রেয়স্কর তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি।

এই মতে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ভেদ নাই, অর্থাৎ জীবাত্মাই পরমাত্মা—পরমাত্মাই জীবাত্মা; তবে যে পরস্পরের ভেদ জ্ঞান হইয়া থাকে তাহা ভ্রম মাত্র। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যে অভেদ আছে তাহা অনু-মান সিদ্ধ। অনুমান প্রণালী এইরূপ, যে ব্যক্তির জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি আছে সে পরমেশ্বর, যাহার জ্ঞান ও ক্রিয়া-শক্তি নাই সে পরমেশ্বর নহে, যেমত গৃহাদি। দেখ যখন জীবাত্মার ঐ ঐ শক্তি দৃষ্ট হইতেছে, তখন জীবাত্মা যে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন তাহার আর সন্দেহ কি।

এ স্থলে কেহ কেহ এই রূপ আপত্তি করিয়া থাকেন যে, যদি জীবের ঈশ্বরতাই থাকে, তবে ঐ ঈশ্বরতাস্বরূপ শিবত্ব প্রাপ্তির নিমিত্ত আত্মপ্রত্যভিজ্ঞার প্রয়োজন কি?

যেমত জলসংযোগাদি হইলে মৃত্তিকায় পতিত বীজ, জ্ঞাতই হউক বা অজ্ঞাতই হউক, অঙ্কুরোৎপাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞাত হউক বা না হউক, বাস্তবিক যদি জীবের ঈশ্বরতা থাকে, তবে ঈশ্বরের ন্যায় জীব জগন্নির্ম্মাণাদি করিতে না পারে কেন? এইরূপ আপত্তি আপাততঃ উত্থাপিত হইতে পারে বটে, কিন্তু বিবেচনা করিলে এ আপত্তি এককালেই ছিন্নমূল হইয়া যাইবে। দেখ কোন কোন স্থলে কারণ থাকিলেই কার্য্য হইয়া থাকে, আর কোন কোন স্থলে কারণ জ্ঞাত হইলেই কার্য্য হয়, যতক্ষণ তাহার জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ সে কারণ দ্বারা কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না; যেমত এই গৃহে পিশাচ আছে এইরূপ না জানিলে তদ্‌গৃহস্থিত পিশাচ হইতে ভীরু ব্যক্তির কোন ভয় জন্মে না, কিন্তু ঐ রূপ জ্ঞান হইলেই ভীরু ব্যক্তির ভয় জন্মে, সেই রূপ জীবের ঈশ্বরতা থাকিলেও উহা জ্ঞাত না হইলে ঈশ্বরের ন্যায় জীবের কার্য্যকরণে ক্ষমতা জন্মে না। কিঞ্চ, যেমন অপরিমিত ধন থাকিলেও উহার অজ্ঞানাবস্থায় প্রীতি জন্মে না, কিন্তু আমার অপরিমিত ধন আছে—এইরূপ জ্ঞান হইলে অসীম আনন্দ হইয়া থাকে, সেইরূপ আমিই ঈশ্বর এই প্রকার জীবের ঈশ্বরতা জ্ঞান হইলে এক অসাধারণ চমৎকার প্রীতি জন্মে, এজন্য আত্মপ্রত্যভিজ্ঞা যে অবশ্য কর্ত্তব্য সন্দেহ কি।

এই মতে পরমাত্মা স্বতঃপ্রকাশমান অর্থাৎ পরমাত্মা আপনিই প্রকাশ পাইতেছেন। যেমত আলোকসংযোগাদি না হইলে গৃহস্থিত ঘটপটাদি বস্তুর প্রকাশ হয় না, সেরূপ পরমেশ্বরের প্রকাশে কোন কারণ অপেক্ষা করে

না, তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা প্রকাশমান রহিয়াছেন। এস্থলে কেহ কেহ এরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরস্পর অভেদ আছে এবং পরমাত্মা সর্ব্বদা পরমাত্মরূপে সর্ব্বত্র প্রকাশমান আছেন, এরূপ স্বীকার করিলে জীবাত্মাও পরমাত্মরূপে সর্ব্বদা প্রকাশমান আছেন স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা কখনই জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরস্পর অভেদ থাকিতে পারে না; কারণ যে বস্তুর অভেদ যে বস্তুতে থাকে, সে বস্তুর প্রকাশ কালে অবশ্যই সে বস্তুর প্রকাশ হয় এরূপ নিয়ম আছে। কিন্তু পরমাত্মরূপে জীবাত্মার যে সর্ব্বদা প্রকাশ হইতেছে ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে জীবাত্মার ঐ রূপ প্রকাশের নিমিত্ত প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনপ্রদর্শনের আবশ্যকতা কি? জীবাত্মার ঐ রূপ প্রকাশ ত সিদ্ধই আছে, সিদ্ধ বিষয় সাধনে কখনই কোন ব্যক্তির প্রবৃত্তি জন্মে না। এরূপ আপত্তি উত্থাপন করিলে এই মাত্র বক্তব্য, যেমত কোন কামাতুরা কামিনী, ঐ বাটীতে এক সুরসিক নায়ক আছে, উহার অতি মধুর স্বর, অনুপম রূপ লাবণ্য ও সহাস্য বদন, এইরূপ উপদেশ পাইয়া সেই বাটীতে সেই নায়কের নিকট গিয়া তাহাকে দর্শন করিয়াও, যত ক্ষণ তাহার ঐ সমস্ত গুণ দৃষ্টিগোচর না করে, তত ক্ষণ আহ্লাদিতা হয় না এবং তদীয় শরীরে সম্পূর্ণ সাত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয় না, সেই রূপ পরমাত্মরূপে জীবের প্রকাশ হইলেও যত দিন পর্য্যন্ত, ঈশ্বরের ঈশ্বরতাদি গুণ আমাতেও আছে—এইরূপ অনুসন্ধান না হয়, তত দিন পূর্ণভাবপ্রাপ্তি হইবার সম্ভাবনা নাই; কি যখন গুরুবাক্য শ্রবণ

করিয়া, সর্ব্বজ্ঞত্বাদিরূপ ঈশ্বরের ধর্ম্ম আমাতেও আছে, এরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তখন পূর্ণভাবের আবির্ভাব হইতে থাকে; অতএব ঐ পূর্ণতা লাভের নিমিত্ত প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন অবশ্যাপেক্ষণীয় সন্দেহ নাই।

রসেশ্বর দর্শন

পদার্থ নির্ণয়াংশে প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের সহিত রসেশ্বর দর্শনের প্রায় ঐকমত্য আছে। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে পারদ পদার্থের বিষয় কোন স্থানে উল্লেখিত হয় নাই, এই দর্শনে উহা বিশেষ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এই মাত্র বিশেষ। যেমত প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনাবলম্বীরা মহেশ্বরকে পরমেশ্বররূপে নির্দ্দেশ এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্নরূপতা স্বীকার করিয়া থাকেন, সেইরূপ রসেশ্বরদর্শনাবলম্বীরাও, মহেশ্বরই পরমেশ্বর এবং জীবাত্মাই পরমাত্মা—এইরূপ স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ নহেন। কিন্তু ইহাঁরা প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনাবলম্বীদিগের স্বকপোলকল্পিত এক মাত্র প্রত্যভিজ্ঞাই পরম পদ মুক্তির সাধন—এরূপ বিশ্বাস না করিয়া পরম মুক্তির প্রাপক অন্য এক পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। ইহাঁরা কহেন যে, মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগকে প্রথমতঃ দেহের স্থৈর্য্যসম্পাদনে যত্ন করিতে হয়, তৎপরে ক্রমশঃ যোগাভ্যাস করিতে করিতে যখন জ্ঞানোদয় হয়, তৎকালে মুক্তিরসের আবির্ভাব হয়। যদিও অন্যান্য দর্শনেও মুক্তির

সাধন এক এক পথ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং তত্তৎ-পথাবলম্বনেও পরমপদ মুক্তি পাইবার সম্ভাবনা আছে, তথাপি তত্তৎ পথাবলম্বনে বিশিষ্ট জনগণের প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারে না; যেহেতু তত্তৎ পথ অবলম্বন করিলেও দেহপতনের পর মুক্তি হয়, এইরূপ তত্তৎ দর্শনেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং তত্তন্মতে মুক্তি, পিশাচের ন্যায়, অদৃষ্টচর হইল। অদৃশ্য বিষয়ে কখনই কোন ব্যক্তির বিশ্বাস জন্মে না; যাহার যে বিষয়ে বিশ্বাস না জন্মে, সে কখনই তজ্জন্য যত্নবান্ হয় না, বরং দূর হউক, সন্দেহ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার আবশ্যকতা নাই এই বলিয়া নিবৃত্ত হইয়াই থাকে। না হইবেই বা কেন? দেখ কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ফণিফণাস্থ মণির আশয়ে অমূল্য ধন জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া ফণিফণায় হস্তার্পণ করিয়া থাকে এবং কাহারই বা, যে পরিচ্ছদের নিমিত্ত সুখ স্বচ্ছন্দতার অদ্বিতীয় উপায় স্বরূপ পূর্ব্বসঞ্চিত পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিতে হয়, তৎসংগ্রহে আগ্রহ জন্মে? অতএব, যদি সর্ব্ব কল্যাণকর সহজসুহৃৎস্বরূপ দেহ ত্যাগ না করিলে মুক্তি না হয়, তবে এমত মুক্তির প্রার্থনায় চির ক্লেশকর যোগাদি করিবার প্রয়োজন কি? কিন্তু যদি পারদ রসের দ্বারা দেহের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া ক্রমশঃ যোগাভ্যাসে ব্যাসক্ত হইতে পারা যায়, তাহা হইলে পরম কারুণিক পরমেশ্বর পরিতুষ্ট হইয়া পারিতোষিক স্বরূপ সর্ব্ব প্রধান মুক্তি পদ প্রদান করেন। এজন্য মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগকে যে প্রথমতঃ দেহস্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে হয় তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি। দেহের স্থৈর্য্যসাধনোপায় পারদরস ব্যতীত আর কোন

পদার্থ নাই। ঐ পারদ রস দ্বারা যেরূপে দেহের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে হয়, অন্যান্য দর্শনে তাহার উল্লেখ মাত্রও নাই। কিন্তু যখন এই দর্শনে উহা সবিশেষ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তখন এ দর্শন যে মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগের অবশ্যাপেক্ষণীয় এবং শ্রেয়স্কর তাহার আর সন্দেহ কি।

পারদ রসের দ্বারা দেহের স্থৈর্য্যসম্পাদন করিলে দেহ সত্ত্বেই মুক্তি হয় বলিয়া এই মুক্তি জীবন্মুক্তি শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। "যদি পারদ রসের দ্বারা দেহস্থৈর্য্য নিষ্পন্ন হইত এবং জীবদবস্থাতেই জীবের জীবন্মুক্তি হইত, তবে অবশ্যই কোন কালে না কোন কালে অন্ততঃ এক জনও স্থিরদেহ সম্পাদন করিয়া জীবন্মুক্ত হইত; কিন্তু যখন তাহা দৃষ্টিগোচর হইতেছে না এবং কোন শাস্ত্রেও অবগত হওয়া যাইতেছে না, তখন পারদরসদ্বারা যে স্থিরদেহ হয় এবং জীবদবস্থাতেই মুক্তি হয় ইহাতেই বা কি রূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে"—এই রূপ আপত্তি যাঁহারা উত্থাপন করিয়া থাকেন, বোধ করি, রসেশ্বরসিদ্ধান্তপ্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ তাঁহারদিগের নয়ন পথে পতিত হয় নাই, হইলে কখনই এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতেন না; যে হেতু ঐ সমস্ত গ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট আছে, মহেশ্বরপ্রভৃতি দেবগণ, কাব্যপ্রভৃতি দৈত্যগণ, বালখিল্যপ্রভৃতি ঋষিগণ, সোমেশ্বরপ্রভৃতি ভূপতিগণ ও গোবিন্দভগবৎপাদাচার্য্য, গোবিন্দনায়ক, চর্ব্বটি, কপিল, ব্যালি, কাপালি, কন্দলায়ন প্রভৃতি সিদ্ধগণ, পারদ-রস দ্বারা দিব্য দেহ সম্পাদন পূর্ব্বক জীবন্মুক্ত হইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছেন। এই রূপে যখন দেহের স্থৈর্য্য সম্পাদন-দ্বারা জীবন্মুক্তি হয় জানা যাইতেছে এবং যে রূপে ঐ

দেহের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে হয় তাহাই এই শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তখন জীবন্মুক্তিই এই শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য ইহা স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন যে, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরমতত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হইলেই ত মুক্তি হইতে পারে, সুতরাং মুক্তির নিমিত্ত এই শাস্ত্রাবলম্বনের আবশ্যকতা কি। কিন্তু এরূপ আপত্তি বিচারসহ হইতে পারে না, দেখ পরমতত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হইলেই মুক্তি হয় একথা সত্য বটে, কিন্তু ঐ পরম তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি বিনা সমাধিতে সম্পন্ন হয় না; সমাধিও বহু কাল সাধ্য—এই দেহে নিষ্পন্ন হওয়া সুকঠিন; তাহার কারণ—প্রথমতঃ এই দেহ শ্বাসকাশাদি নানা রোগের আশ্রয়, বিনশ্বর এবং সমাধিকরণক্লেশসহনে অশক্ত; দ্বিতীয়তঃ বাল্যাবস্থায় ধীশক্তি জন্মে না, যৌবনাবস্থায় বিষয়রসাস্বাদে ব্যগ্র হইয়া পরকালের নিমিত্ত ক্ষণ কালও চিন্তা করিতে প্রবৃত্তি হয় না এবং বৃদ্ধাবস্থায় বিবেক শক্তি থাকে না, তৎপরেই দেহ পতন হইয়া যায়; সুতরাং এই দেহে সমাধি নিষ্পন্ন হইতে পারে না। এজন্য প্রথমতঃ পারদরস দ্বারা দিব্য দেহ সম্পাদন করিতে হয়, তাহা হই-লেই ক্রমশঃ যোগাভ্যাসাদি দ্বারা পরম তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে, নতুবা এই অস্থির দেহে কখনই পরম তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। তন্নিমিত্তই এই দর্শনে দেহ স্থৈর্য্য-সাধনপথ প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই পারদ রসকে সামান্য ধাতুর ন্যায় জ্ঞান করা উচিত নহে; যেহেতু স্বয়ং ভগবান্ মহাদেব ভগবতীকে কহিয়াছেন যে, পারদ রস আমার স্বরূপ, ইহা আমার

অত্যঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং আমারই দেহের রস; এই জন্য ইহাকে রস কহে। এই পারদ সংসার রূপ সমুদ্রের যন্ত্রণা নিবৃত্তি স্বরূপ পার প্রদান করে বলিয়া ইহাকে পারদ শব্দে নির্দ্দেশ করে। ঐ পারদ আমার বীজ এবং অভ্রক তোমার বীজ, এই দুই বীজের যথাবিধানে মিলন সম্পন্ন করিতে পারিলে মৃত্যু ও দারিদ্র্যযন্ত্রণা এককালে দূরীকৃত হয়। পারদ নানা প্রকার; তন্মধ্যে এক এক পারদের এক একটী অসাধারণ গুণ আছে। মূর্চ্ছিত পারদ দ্বারা ব্যাধি বিনষ্ট হয়, মৃত পারদ দ্বারা জীবিত হওয়া যায়, এবং বদ্ধ পারদ দ্বারা শূন্যমার্গে গতিশক্তি জন্মে। যে পারদের নানা বর্ণ দৃষ্ট হয় এবং ঘনতা ও তরলতাদি ধর্ম্ম না থাকে তাহাকে মূর্চ্ছিত কহে, যে পারদে আর্দ্রত্ব, ঘনত্ব, তেজস্বিতা, গুরুতা ও চপলতাদি গুণ না থাকে তাহাকে মৃত কহে, এবং যে পারদ অক্ষত, নির্ম্মল, তেজস্বী ও গুরু এবং যাহার ত্বরায় দ্রবীভাব হয় তাহাকে বদ্ধ পারদ কহে।

পারদের গুণ অধিক কি লিখিব—পারদ দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ স্বরূপ চতুর্ব্বর্গের মূলীভূত এবং সকল বিদ্যার ও সুখস্বচ্ছন্দতার আধার স্বরূপ দেহ অজরামর হয়, উহা ব্যতীত দেহের নিত্যতাসম্পাদক উপায়ান্তর নাই এবং উহার দর্শন, স্পর্শন, ভক্ষণ, স্মরণ, পূজন ও দানে সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। পৃথিবীমধ্যে কেদারাদি যে সমস্ত শিবলিঙ্গ আছেন, তত্তাবতের দর্শন করিলে যে পুণ্যসঞ্চয় হয়, তাহা এক মাত্র পারদ দর্শনে জন্মে। কাশ্যাদিতীর্থস্থানস্থ যে যে শিবলিঙ্গ আছেন, সে সকলের পূজা অপেক্ষা

এক পারদনির্ম্মিত শিবলিঙ্গ পূজন শ্রেয়স্কর; যেহেতু তদ্দ্বারা সকল বিষয়ের ভোগসাধন আরোগ্য এবং অমৃত পদ পাওয়া যায়। দৈবাধীন যদি পারদ রসের নিন্দা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলেও পাপ জন্মে, ; এজন্য পারদরসনিন্দক ব্যক্তিদিগের সহবাস পরিত্যাগ করা বিধেয়। এই সকলগুণ-সদ্ভাববশতঃ পারদরস অন্যান্য রস অপেক্ষা উত্তম বলিয়া উহাকে রসেন্দ্র ও রসেশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, ঐ রসেশ্বরের গুণ এই দর্শনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া এই দর্শনকে রসেশ্বর দর্শন কহে।

ঔলূক্য দর্শন।

যে মহর্ষি এই দর্শনের প্রণয়ন করিয়াছেন তাঁহার নাম কণাদ ও উলূক, এজন্য এই দর্শনকে কাণাদ ও ঔলূক্য-দর্শন কহে। অন্যান্যদর্শনানভিমত বিশেষনামক একটী স্বতন্ত্র পদার্থ নির্দ্দিষ্ট থাকায় ইহাকে বৈশেষিক দর্শনও বলিয়া থাকে। আর যখন বেদান্ত, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, ন্যায় ও বৈশেষিক, এই কয়েকটী দর্শন সুপ্রসিদ্ধ ষড়্দর্শন বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, এবং ঔলক্য দর্শনই বৈশেষিক দর্শন ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন এই ঔলূক্যদর্শন যে ষড়্দর্শনান্তর্গত, তাহা বলা পুনরুক্তি মাত্র।

এই মতে অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির নাম মুক্তি। যে দুঃখনিবৃত্তি

হইলে কোন কালেই আর দুঃখ না জন্মে, তাহাকে অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি কহে। ঐ মুক্তি আত্মসাক্ষাৎকারস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত জন্মে না; কিন্তু ঐ তত্ত্বজ্ঞান সহজোপায়সাধ্য নহে, প্রথমতঃ শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদিদ্বারা আত্মার স্বরূপ ও গুণাদি শ্রবণ করিতে হয়; পরে আত্মার স্বরূপ ও গুণাদি শ্রুতিতে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে উহা যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে কি না—এই সন্দেহনিরাসার্থ তাহার অনুমান স্বরূপ মনন করিয়া নিদিধ্যাসন (যোগবিশেষ) করিতে পারিলে, তত্ত্বজ্ঞান হয়, নতুবা তত্ত্বজ্ঞানের উপায়ান্তর নাই। এজন্য শাস্ত্রে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন, এই তিনটীই তত্ত্বজ্ঞানের উপায়রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে; তন্মধ্যে শ্রবণের উপনিষদাদি অনেক সাধন আছে। ভগবান্ কণাদ মহর্ষি, শিষ্যপ্রার্থনানুরোধে মননের অদ্বিতীয় সাধন স্বরূপ দশাধ্যায়াত্মক এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।*

এই শাস্ত্রের সকল অধ্যায়েই দুই দুইটী আহ্নিকনামক বিরামস্থান আছে। তন্মধ্যে প্রথমাধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম পদার্থ, দ্বিতীয়াহ্নিকে জাতি ও বিশেষ পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে; দ্বিতীয়ের প্রথমাহ্নিকে পৃথিবী, জল, তেজঃ বায়ু ও আকাশ পদার্থ, দ্বিতীয়ে দিক্ ও কাল; তৃতীয়ের প্রথমে আত্মা, দ্বিতীয়ে অন্তঃকরণ; চতুর্থের প্রথমে শরীরোপযোগী, দ্বিতীয়ে শরীর; পঞ্চমের প্রথমে শারীরিক কর্ম্ম, দ্বিতীয়ে মানসিক কর্ম্ম; ষষ্ঠের প্রথমে দানের ও প্রতিগ্রহের ধর্ম্ম, দ্বিতীয়ে চতুরাশ্রমী ব্যক্তিদিগের ধর্ম্ম; সপ্তমের প্রথমে

* এই অংশ বৈশেষিক দর্শনাবলোকন ব্যতিরেকে সাধারণের অনায়াসে বোধগম্য হইবেক এমত প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

বিশেষরূপে বুদ্ধিভিন্ন গুণ পদার্থ, দ্বিতীয়ে বুদ্ধির সহিত গুণ পদার্থ ও সমবায় পদার্থ; অষ্টমের প্রথমে সবিকল্পক* ও নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয়ে বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী প্রত্যক্ষ; নবমের প্রথমে অলৌকিকসন্নিকর্ষাদিজন্য প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয়ে অনুমান,† দশমের প্রথমে আত্মগুণের পরস্পর ভেদ, দ্বিতীয়ে বিশেষরূপে সমবায়ি প্রভৃতি কারণত্রয় নিরূপিত হইয়াছে।

এই মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমানাতিরিক্ত প্রমাণান্তর নাই। অন্যান্য দর্শনকারকেরা শব্দাদি যে সমস্ত প্রমাণ স্বীকার করেন সে সকলই অনুমান স্বরূপ, অনুমানাতিরিক্ত নহে; এবং পদার্থ দ্বিবিধ ভাব ও অভাব। ভাব পদার্থ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, জাতি, বিশেষ ও সমবায় ভেদে ষড়্বিধ। তন্মধ্যে দ্রব্য পদার্থ নয় প্রকার; পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মনঃ। যে দ্রব্যের গন্ধ আছে তাহার নাম পৃথিবী, যেমন ফল পুষ্পাদি; আর যে দ্রব্যের গন্ধ নাই সে পৃথিবী নয়, যেমন জলাদি। এ স্থলে এরূপ আপত্তি করিও না যে, গন্ধ না থাকিলে যদি পৃথিবী না হয়, তবে

---

* বৈশেষিক সূত্রোপস্কারমতে ইহা লিখিত হইল।

† "যদিও সর্ব্বদর্শন সংগ্রহগ্রন্থে "দশমে অনুমানভেদ প্রতিপাদনম্" অর্থাৎ দশমাধ্যায়ে অনুমানের ভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে, এইরূপ লিখিত আছে, তথাপি এস্থলে আমরা তদনুবর্ত্তী হইতে পারিলাম না; যেহেতু বৈশেষিক দর্শনের দশমাধ্যায়ে বাস্তবিক অনুমানভেদ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই; সুতরাং প্রকৃত গ্রন্থবিরুদ্ধ, বৈশেষিক সূত্রোপস্কার পরিষ্কৃত পথাবলম্বনে অগত্যা সম্মত হইতে হইল। সংগ্রহ গ্রন্থে যে ঐ রূপ লিখিত আছে, তাহা, বোধ করি, লিপিকরভ্রমবশতই ঘটিয়া থাকিবে। গ্রন্থকারের ভ্রম বলা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে।

প্রস্তরাদিতে গন্ধ নাই, উহা পৃথিবী না হউক, যেহেতু প্রস্তরাদিরও গন্ধ আছে, কিন্তু ঐ গন্ধ উৎকট নহে এজন্য উহার উপলব্ধি হয় না। প্রস্তরাদিতে গন্ধের উপলব্ধি না হইলেও উহাতে গন্ধ আছে, ইহা অনুমানসিদ্ধ।

যে দ্রব্যের স্নেহগুণ আছে, তাহাকে জল পদার্থ কহে; জল ব্যতীত আর কাহারও স্নেহগুণ নাই। যাহার উষ্ণ স্পর্শ আছে, তাহা তেজঃ পদার্থ। যাহার স্পর্শ স্বাভাবিক অনুষ্ণাশীত, অর্থাৎ না শীতল না উষ্ণ মধ্যমরূপ, তাহাকে বায়ু কহে। বায়ুর যে বক্রভাবে গতিশক্তি আছে তাহা অনুমানসিদ্ধ। দেখ যদি বায়ুর ঐ রূপ গতিশক্তি না থাকিত, তবে কখনই গবাক্ষ দ্বারের সমসূত্রপাতস্থানাতিরিক্ত স্থানে বায়ু দ্বারা প্রদীপ নির্ব্বাণ হইত না। পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারিটী দ্রব্য প্রত্যেকে নিত্য ও অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ। পরমাণুরূপ পৃথিব্যাদি নিত্য, তদতিরিক্ত অনিত্য। যাহার নিজের অবয়ব নাই, কিন্তু যে পরম্পরায় সকলেরই অবয়ব এবং যাবৎ সূক্ষ্ম পদার্থের শেষসীমাস্বরূপ, তাহাকে পরমাণু কহে। রবিকিরণ সম্পর্কে গবাক্ষদ্বারের নিকট ত্রসরেণু স্বরূপ যে সূক্ষ্ম পদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহাকে তিন অংশে বিভক্ত করিলে যত হয় তাহার এক অংশকে দ্ব্যণুক, আর দ্ব্যণুকের দুই অংশের এক অংশকে পরমাণু কহে। এই চারিটী দ্রব্যেরই আকার আছে, এতদতিরিক্ত সকল দ্রব্যই নিরাকার ও নিত্য। এবং এই চারিটী দ্রব্যঘটিত এক একটী শরীর আছে, যথা পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়। তন্মধ্যে পার্থিব শরীর মনুষ্যাদির, জলীয় শরীর বরুণলোকে প্রসিদ্ধ, তৈজস শরীর সূর্য্যলোকস্থিত জীবের, এবং বায়বীয় শরীর পিশা-

চাদির। যে দ্রব্যের গুণ শব্দ তাহাকে আকাশ কহে। যে স্থানে যত শব্দ হইতেছে, সে সমুদয় আকাশে আছে, আকাশ ব্যতীত শব্দের আশ্রয়ান্তর নাই।

পৃথিবী অবধি আকাশ পর্য্যন্ত পাঁচটী দ্রব্যঘটিত এক একটী ইন্দ্রিয় আছে, ঐ ঐ ইন্দ্রিয় দ্বারা এক একটী অসাধারণ গুণাদির উপলব্ধি হইয়া থাকে। যথা পার্থিবেন্দ্রিয় নাসিকা দ্বারা গন্ধাদির, জলীয়েন্দ্রিয় রসনা দ্বারা মধুর রসাদির, তৈজসেন্দ্রিয় নয়ন দ্বারা রূপাদির, বায়বীয়েন্দ্রিয় ত্বক্ দ্বারা উষ্ণ স্পর্শাদির, এবং আকাশেন্দ্রিয় শ্রোত্র দ্বারা শব্দাদির উপলব্ধি হইয়া থাকে। যাহাকে অবলম্বন করিয়া জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ব্যবহার হইয়া থাকে তাহার নাম কাল। উভয়ে এক মাতাপিতার সন্তান হইলেও যে ব্যক্তি অধিক কাল জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে জ্যেষ্ঠ, আর যে ব্যক্তি অল্পকাল জন্মিয়াছে তাহাকে কনিষ্ঠ বলিয়া যে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে, তাহার প্রধান কারণ কাল। যদি কাল না থাকিত, তবে কখনই কালঘটিত এরূপ ব্যবহার হইত না। কাল একমাত্র, তবে যে ক্ষণ, দিন, মাস ও বৎসরাদিরূপ বিভিন্ন ব্যবহার হইয়া থাকে সে কেবল উপাধিভেদনিবন্ধন। যেমত কটক ও কুণ্ডলাদিরূপ উপাধি ভেদে এক সুবর্ণকে বিভিন্ন রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে, সেইরূপ ক্ষণাদি এক কালেরই উপাধি মাত্র, বস্তুতঃ বিভিন্ন নহে। যাহার সদ্ভাবে দূরতা ও নৈকট্য ব্যবহার হইয়া থাকে তাহাকে দিক্ কহে। যদিও দিক নিত্য এবং একমাত্র, তথাপি শাস্ত্রকারেরা এক এক বস্তুর সন্নিকর্ষ ও বিপ্রকর্ষ ভেদে উহার এক একটী উপাধি প্রদান করিয়াছেন। এজন্য

ঐ ঐ উপাধির ভেদ লইয়া দিকের বিভিন্নরূপতা প্রতীতি হয়। যথা যে দিক্ উদয়গিরির সন্নিহিত তাহাকে পূর্ব্ব, আর যাহা উহার বিপ্রকৃষ্ট তাহাকে পশ্চিম, যাহা সুমেরু পর্ব্বতের সন্নিহিত তাহাকে উত্তর এবং যাহা উহার বিপ্রকৃষ্ট তাহাকে দক্ষিণ দিক্ কহে।

যাহার চৈতন্য আছে সে আত্মপদবাচ্য। আত্মা সকল ইন্দ্রিয় ও শরীরের অধিষ্ঠাতা, আত্মা না থাকিলে কোন ইন্দ্রিয়-দ্বারাই কোন কার্য্য সম্পন্ন হইত না। যেমত রথগমন-দ্বারা সারথির অনুমান করা যায়, সেইরূপ জড়াত্মক দেহের চেষ্টাদি দেখিয়া আত্মাও অনুমিত হইতে পারে। চৈতন্য শক্তি শরীরাদির সম্ভবে না; কারণ যদি ঐ শক্তি শরীরাদির থাকিত, তবে মৃত ব্যক্তির শরীরেও চৈতন্যের উপলব্ধি হইত সন্দেহ নাই। এবং যখন আমার শরীর ক্ষীণ হইয়াছে, আমার চক্ষুঃ বিকৃত হইয়াছে এইরূপ সকল লোকে-রই প্রতীতি হইতেছে, তখন আত্মা যে শরীর ও ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ তাহা স্পষ্ট রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। আত্মা দ্বিবিধ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা। মনুষ্য, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকলই জীবাত্মপদবাচ্য, পরমাত্মা এক মাত্র পর-মেশ্বর। যাহার দ্বারা সুখ দুঃখাদির অনুভব হয়, শরী-রান্তর্ব্বর্ত্তী এমত এক সূক্ষ্ম পদার্থকে মন কহে। উহা অন্তরে-ন্দ্রিয় শব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সং-যোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম শব্দ ভেদে গুণপদার্থ চতুর্ব্বিংশতিবিধ। নীল পীতাদি বর্ণকে রূপ

কহে। রূপ* ঐ ঐ বর্ণভেদে নানাবিধ, যে বস্তুর রূপ নাই, তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না, আর যাহার রূপ আছে, তাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে; এজন্য রূপকে দর্শনের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

রস ষড়্বিধ; যথা কটু, কষায়, তিক্ত, অম্ল, লবণ আর মধুর। গন্ধ দ্বিবিধ; সৌরভ ও অসৌরভ। পদ্মপুষ্প ও পক্কাম্র প্রভৃতির গন্ধ সৌরভ অর্থাৎ উত্তম গন্ধ, এবং মূত্র ও পুরীষাদির গন্ধ অসৌরভ অর্থাৎ দুর্গন্ধ। উষ্ণ, শীত এবং অনুষ্ণাশীত ভেদে স্পর্শ ত্রিবিধ। পৃথিবীতে যে কাঠিন্য ও কোমলতাদির অনুভব হইয়া থাকে, তাহাও স্পর্শ-বিশেষ, গুণান্তর নহে। একত্ব, দ্বিত্ব ও ত্রিত্বাদি ভেদে সংখ্যা নানাবিধ। যদি সংখ্যা পদার্থ না থাকিত, তবে একটী মৎস্য, দুইটী পশু, তিন জন মনুষ্য—এইরূপ গণনা করা যাইত না; যে হেতু ঐরূপ গণনা সংখ্যা-পদার্থকে অবলম্বন করিয়াই হইয়া থাকে। তন্মধ্যে একত্ব সংখ্যা একটী মাত্র বস্তুতে থাকে, দ্বিত্ব একে থাকে না দুয়ে থাকে, ত্রিত্ব একে বা দুয়ে থাকে না তিনে থাকে। উত্তরোত্তর সংখ্যারও এই রীতি আছে। পরিমাণ চারি প্রকার; স্থূল, সূক্ষ্ম দীর্ঘ ও হ্রস্ব। যাহাকে অবলম্বন করিয়া "ঘটঃ পটাৎ পৃথক্" অর্থাৎ ঘট পট-হইতে পৃথগ্‌ভূত এই রূপ ব্যবহার হইয়া থাকে তাহাকে পৃথক্ত্ব কহে। অসন্নিকৃষ্ট বস্তু দ্বয়ের মিলন এবং সন্নিকৃষ্ট বস্তুদ্বয়ের বিয়োগকে যথাক্রমে

* তর্কামৃতগ্রন্থের মতে শুক্ল, নীল, পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ ও চিত্র এই সপ্ত প্রকার রূপ।

সংযোগ ও বিভাগ * কহে। পরত্ব ও অপরত্ব গুণ প্রত্যেকে দৈশিক ও কালিক ভেদে দ্বিবিধ; দৈশিক পরত্ব "অমুক নগর হইতে অমুক নগর দূর" এইরূপ দূরত্ব-বুদ্ধির, আর দৈশিক অপরত্ব "অমুক স্থান হইতে অমুক স্থান নিকট" এইরূপ নৈকট্য জ্ঞানের কারণ। আর কালিক পরত্ব ও অপরত্ব যথাক্রমে জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব-ব্যবহারের উপযোগী।

বুদ্ধিশব্দে জ্ঞান বুঝায়। জ্ঞান দ্বিবিধ, যথা প্রমা ও ভ্রম। যাহার যে যে গুণ ও দোষ আছে, তাহাকে তত্তৎ গুণ ও দোষশালী বলিয়া জানাকে যথার্থ জ্ঞান এবং প্রমা কহে; যেমন জ্ঞানী ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলিয়া এবং অন্ধকে অন্ধ বলিয়া জানা। এবং যাহার যে যে গুণ ও দোষ নাই, তাহাকে সেই সেই গুণ ও দোষশালী বলিয়া জানাকে অযথার্থ জ্ঞান এবং ভ্রম কহে; যেমন পণ্ডিতকে মূর্খ বলিয়া ও রজ্জুকে সর্প বলিয়া জানা। ভ্রমের একটী অনুগত কারণ কিছুই নাই, এক এক ভ্রম এক এক দোষ বশতঃ ঘটিয়া থাকে; পিত্তাধিক্য রূপ দোষ ঘটিলে অতি শুভ্র শঙ্খকেও পীতবর্ণ দেখা যায়, অতিদূরতা-নিবন্ধন অতি-বৃহৎ চন্দ্রমণ্ডলকেও ক্ষুদ্র জ্ঞান হয় এবং মণ্ডূকের বসাদ্বারা সম্পাদিত অঞ্জন নয়নে অর্পণ করিলে বংশকেও সর্প বলিয়া বোধ হয়। ঐ ঐ দোষ দ্বারা যখন ভ্রম ঘটে, তখন আর সহসা যথার্থ জ্ঞান হয় না; যত ক্ষণ ঐ ঐ দোষ দূরীকৃত না হয়, তত ক্ষণ ঐ ঐ ভ্রম থাকে। দেখ, শঙ্খ অতিশুভ্র, শঙ্খ শুভ্র ব্যতীত পীত হয় নাই, এইরূপ

* সংযোগ ত্রিবিধ, যথা একক্রিয়াজন্য, উভয়ক্রিয়াজন্য ও সংযোগজন্য বিভাগও তিন প্রকার: একক্রিয়াজন্য, উভয়ক্রিয়াজন্য ও বিভাগজন্য।

শত শত উপদেশ পাইলেও, কিংবা সেই শঙ্খকেই শ্বেত বলিয়া পূর্ব্বে নিশ্চয় করিলেও, যখন পিত্তাধিক্য হয়, তখন কোন ক্রমে শঙ্খকে পীত বই আর শ্বেত বোধ হয় না।

নিশ্চয় ও সংশয় ভেদেও জ্ঞানের দ্বিবিধ বিভাগ করা যাইতে পারে। এই ভবনে মনুষ্য আছে, আর এই ভবনে মনুষ্য আছে কি না—এইরূপ জ্ঞানদ্বয়কে যথাক্রমে নিশ্চয় ও সংশয় কহে। সংশয় নানা কারণে ঘটিতে পারে। কখন পরস্পর-বিরুদ্ধ-বাক্য-রূপ বিপ্রতিপত্তি বাক্য শ্রবণে উহা ঘটিয়া থাকে; যথা, যখন, গৃহে মনুষ্য আছে কিনা কিছুই নিশ্চয় নাই, তৎকালে যদি এক জন বলে এই-গৃহে মনুষ্য আছে, আর অন্য জন কহে, না কই এ গৃহে ত মনুষ্য নাই, তখন সে গৃহে মনুষ্য আছে কি না কিছুই নিশ্চয় করা যাইতে পারে না, কেবল সংশয়ারূঢ়ই হইতে হয়। আর সংশয় কখন, সাধারণ ও অসাধারণ ধর্ম্ম দর্শন হইলেও, হইয়া থাকে। দেখ, যখন দেখা যাই-তেছে কোন গৃহে লেখনী ও পুস্তক উভয়ই আছে, আর কোন গৃহে লেখনী মাত্র আছে পুস্তক নাই, তখন ইহাই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, লেখনী থাকিলেই পুস্তক থাকে এমত নিয়ম নাই। লেখনী থাকিলে পুস্তক থাকিলেও থাকিতে পারে এবং পুস্তকের অভাব থাকিলেও থাকিতে পারে; সুতরাং লেখনী পুস্তক ও তদভাবের সহচররূপ সাধারণ ধর্ম্ম হইল। সাধারণ ধর্ম্মরূপ লেখনী দর্শনে কোন্ ব্যক্তি নিশ্চয় করিতে পারে যে, এই গৃহে পুস্তক আছে; প্রত্যুত ঐ লেখনী দর্শনে এরূপ সংশয়ই হইয়া থাকে যে, এ স্থানে পুস্তক আছে, কি না? আর সন্দিগ্ধ বস্তু ও তদভাবের

সহিত যে বস্তুর সহাবস্থান পূর্ব্বদৃষ্ট না হইয়াছে এমত অবস্থায় সেই বস্তুর দর্শনকে অসাধারণধর্ম্মদর্শন কহে; যেমন যে ব্যক্তির, নকুল থাকিলে সর্প থাকে কি না থাকে একতরের নিশ্চয় নাই, সে ব্যক্তি যদি নকুল দেখে, তবে তাহার সর্প বা তদভাব কাহারই নিশ্চয় হয় না, কেবল সর্প আছে কি না, এমত সংশয়ই হইয়া থাকে। বিশেষদর্শন হইলে সংশয়ের নিবৃত্তি হয়। বিশেষ পদে, যে বস্তুর সংশয় হয়, তাহার ব্যাপ্যকে বুঝায়। যে বস্তু না থাকিলে যে বস্তু থাকে না, তাহার ব্যাপ্য সেই বস্তু হয়, যথা বহ্নি না থাকিলে ধূম থাকে না বলিয়া বহ্নির ব্যাপ্য ধূম, সুতরাং যত ক্ষণ না ধূম দর্শন হয় তত ক্ষণ বহ্নির সংশয় থাকে; কিন্তু ধূম দৃষ্টিপথে পতিত হইলেই বহ্নির সংশয় প্রস্থান করে।

অনুভব ও স্মরণ ভেদে বুদ্ধিও দুই প্রকার হইতে পারে।

সুখ ও দুঃখ যথাক্রমে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন হয়। সুখ যাবতীয় প্রাণীর অভিপ্রেত এবং দুঃখ অনভিপ্রেত। আনন্দ ও চমৎকারাদি ভেদে সুখ, আর ক্লেশাদি ভেদে দুঃখ নানাবিধ। অভিলাষকেই ইচ্ছা কহে। সুখে এবং দুঃখাভাবে ইচ্ছা ঐ ঐ পদার্থের জ্ঞান হইলেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সুখ ও দুঃখ-নিবৃত্তির সাধনে সুখসাধনতা-জ্ঞান ও দুঃখনিবর্ত্তকতা-জ্ঞান হইলে, অর্থাৎ "এই বস্তু হইতে আমার সুখ আর এই বস্তু হইতে আমার দুঃখনিবৃত্তি হইবে" এইরূপ জ্ঞান হইলে, যথা-ক্রমে সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ে ইচ্ছা জন্মে। দেখ, যে ব্যক্তি জানে স্রক্‌চন্দনাদি আমার সুখজনক এবং ঔষধপান আমার দুঃখনিবর্ত্তক, তাহারই ঐ ঐ বিষয়ে ইচ্ছা জন্মে, আর যাহার ঐরূপ জ্ঞান না থাকে তাহার কখনই ঐ ঐ

বিষয়ে ইচ্ছা জন্মে না। ইষ্ট সাধনতা জ্ঞানের ন্যায়, চিকীর্ষার আরও দুইটি কারণ আছে; যথা কৃতিসাধ্যতা-জ্ঞান, আর বলবদনিষ্টসাধনতাজ্ঞানের অভাব। এই বিষয় আমি করিতে পারি এইরূপ জ্ঞানের নাম কৃতিসাধ্যতা-জ্ঞান। আর এই বিষয় করিলে আমার মহৎ অনিষ্ট ঘটিবে এইরূপ জ্ঞানের অভাবকে বলবদনিষ্টসাধনতা জ্ঞানের অভাব বলে। দেখ, যোগাভ্যাস করা অস্মদাদির কৃতিসাধ্য নহে এইরূপ যাহাদিগের স্থির নিশ্চয় আছে, কখনই তাহাদিগের যোগাভ্যাস করিতে ইচ্ছা জন্মে না। কিন্তু অনায়াসেই যোগাভ্যাস করা যাইতে পারে এইরূপ যোগী-দিগের নিশ্চয় থাকায় তাঁহারা তদ্বিষয় সম্পাদনে অভিলাষী হইতেছেন। এবং যে ব্যক্তি জানে যে, এই ফলটী সুমধুর বটে, কিন্তু সর্পদষ্ট হওয়াতে ইহা বিষাক্ত হইয়াছে, সুতরাং ইহা ভক্ষণ করিলে প্রাণত্যাগ হইবে সন্দেহ নাই; সে ব্যক্তির কখনই সে ফল ভক্ষণে প্রবৃত্তি জন্মে না। কিন্তু যাহার ঐরূপ জ্ঞান না থাকে, সে তৎক্ষণাৎ ঐ ফল ভক্ষণে চিকীর্ষু হয়। যে বিষয় হইতে দুঃখ হইবার সম্ভাবনা থাকে সে বিষয়ে দ্বেষ জন্মে, যদি সে বিষয় হইতে কোন ইষ্ট-সিদ্ধির সম্ভাবনা না থাকে। দেখ, এ সময় গমন করিলে রবিকিরণোত্তাপে ক্লান্ত-কলেবর হইতে হইবে—ইহা জা-নিয়া কোন্ ব্যক্তির সে সময় গমনে দ্বেষ না জন্মে? কিন্তু যদি তৎকালে এমত নিশ্চয় থাকে যে, এ সময় গমন করিলে একটু ক্লেশ হয় বটে, কিন্তু সহস্র মুদ্রা পাওয়া যাইতে পারে, তবে তৎকালে গমনে কোন্ ব্যক্তির দ্বেষ জন্মে? বরং অনেকেই যাইবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়া থাকে।

যত্ন তিন প্রকার; প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি আর জীবনযোনি। যে বিষয়ে যাহার চিকীর্ষা থাকে, সে বিষয়ে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে। আর যাহার যে বিষয়ে দ্বেষ থাকে, সে তদ্বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়। এ জন্য প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির প্রতি যথাক্রমে চিকীর্ষা * ও দ্বেষ কারণ। যে যত্ন থাকায় জীবিত থাকা যায়, তাহাকে জীবনযোনি যত্ন কহে। জীবনযোনি যত্ন না থাকিলে জন্তু সকল ক্ষণ-কালও জীবিত থাকে না, এই জন্য ইহার জীবনযোনি নাম অন্বর্থ হইতেছে। ঐ যত্ন দ্বারাই প্রাণিগণের শ্বাসপ্রশ্বাসাদি নির্ব্বাহিত হইতেছে।

গুরুত্ব পতনের কারণ; যাহার গুরুত্ব নাই, সে পতিত হয় না, যেমত তেজঃপ্রভৃতি। দ্রবত্ব ক্ষরণের কারণ। ইহা স্বাভাবিক ও নৈমিত্তিক ভেদে দ্বিবিধ। জলের দ্রবত্ব স্বাভাবিক। পৃথিবী ও কোন কোন তেজের দ্রবত্ব নিমিত্তাধীন হইয়া থাকে বলিয়া ঐ ঐ পদার্থের দ্রবত্বকে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব কহে; যেমত তত্যন্ত অগ্নিসংযোগে ইষ্টকাদিরূপ পৃথিবী এবং সুবর্ণরূপ তেজঃপদার্থ দ্রবীভূত হইয়া যায়। জলের যে গুণের সদ্ভাবে তদ্দ্বারা শক্তু প্রভৃতি চূর্ণ বস্তু পিণ্ডীকৃত হয়, তাহাকে স্নেহ কহে। স্নেহ উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ভেদে দ্বিবিধ। উৎকৃষ্ট স্নেহ অগ্নিপ্রজ্বলনের, আর অপকৃষ্ট স্নেহ অগ্নি নির্ব্বাণের কারণ। যথা, তৈলান্তর্ব্বর্ত্তী জলীয়ভাগের উৎকৃষ্ট স্নেহ থাকায় উহার দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া থাকে এবং অন্যান্য জলের অপকৃষ্ট স্নেহ থাকায় তদ্দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।

---

* কেবল চিকীর্ষাই প্রবৃত্তির কারণ নহে, উপাদানপ্রত্যক্ষও কারণ (সহকারী) হইয়া থাকে।

সংস্কার ত্রিবিধ; বেগ, স্থিতিস্থাপক ও ভাবনা। বেগ ক্রিয়াদি দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে বস্তুর বেগ যত ক্ষণ থাকে, তাহার গতিশক্তিও তত ক্ষণ থাকে। বেগ নিবৃত্ত হইলেই গতিশক্তি নিবৃত্ত হইয়া যায়; যেমত শর বিক্ষেপ করিলে শরের বেগ জন্মে, এবং ঐ বেগ দ্বারা শরের গতি-শক্তি জন্মে; আর যত ক্ষণ শরের বেগ থাকে তত ক্ষণ তাহার গতিশক্তিও থাকে। বৃক্ষের শাখা আকর্ষণ করিয়া বিমোচন করিলে যে গুণের সদ্ভাবে উহা পূর্ব্বস্থান-স্থিত হয়, তাহাকে স্থিতিস্থাপক সংস্কার কহে। যে সংস্কার দ্বারা পূর্ব্বানুভূত বস্তু সকলের স্মরণ হয়, তাহাকে ভাবনা সংস্কার কহে। যে বিষয়ে ঐ সংস্কার না থাকে, সে বিষয়ের স্মৃতি হয় না। এজন্য ঐ সংস্কারকে স্মৃতির কারণ কহে। সংস্কার উপেক্ষানাত্মক জ্ঞান হইতে হইয়া থাকে; যে বস্তু জানিতে ইচ্ছা থাকে তাহার উপেক্ষানাত্মক জ্ঞান হয়, আর যে বিষয়, দর্শনেচ্ছা না থাকিলেও, সহসা দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া জ্ঞাত হয়, সে বিষয়ের ঐ জ্ঞানকে উপেক্ষাত্মক জ্ঞান কহে। ফলতঃ উপেক্ষাত্মক ও অনুপেক্ষাত্মক জ্ঞান অনুভব-সিদ্ধ জ্ঞানবিশেষ, উহা সবিশেষ ব্যক্ত করা সুকঠিন। দেখ, তৃণ আর রমণী উভয়েই দৃষ্টিপথে পতিত হয় বটে; কিন্তু তৃণ ও রমণী দর্শনে যথাক্রমে ইচ্ছার অসদ্ভাব ও সদ্ভাব থাকায়, ঐ ঐ বিষয়ে উপেক্ষাত্মক ও অনুপেক্ষা-ত্মক জ্ঞান জন্মে; এ জন্য ঐ ঐ বিষয়ে যথাক্রমে সংস্কারের অনুৎপত্তি ও উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং তৃণের সংস্কার না থাকায় তৃণ বিষয়ক স্মৃতি হয় না; পরন্তু রমণী বিষয়ক সংস্কার থাকাতে রমণী সর্ব্বদাই স্মৃতি-

পথারূঢ়া হয়। যে সংস্কার দৃঢ় কিংবা দৃঢ়তর না হয়, তাহা অল্প কালেই বিনষ্ট হয়। যে বিষয়ের বারংবার আলোচনা করা যায়, সে বিষয়ে দৃঢ় এবং তদধিক আলোচনায় দৃঢ়তর সংস্কার জন্মে। ঐ ঐ সংস্কার অধিক কাল থাকে এবং যত ক্ষণ সে ব্যক্তির বসন কিংবা ভূষণাদির দর্শনরূপ উদ্বোধকের সমবধান না হইতেছে, তত ক্ষণ সে ব্যক্তি পূর্ব্বাবগত হইলেও কেবল সংস্কার দ্বারা স্মৃতিপথারূঢ় হইতেছে না, এ জন্য সংস্কার যে স্মৃতিবিষয়ে স্মর্ত্তব্য বস্তুর অনুষঙ্গীর জ্ঞানাদিরূপ উদ্বোধকের সহায়তা অবলম্বন করে তাহার আর সন্দেহ কি?

ধর্ম্ম শুভাদৃষ্ট ও পুণ্যাদি-পদবাচ্য। ইহা গঙ্গাস্নান ও যাগাদিদ্বারা জন্মে এবং কর্ম্মনাশা নদীর জলস্পর্শাদিতে বিনষ্ট হয়, এজন্য হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরা অদ্যাপি ঐ নদীর জল স্পর্শ করেন না। ঐ ধর্ম্মদ্বারা স্বর্গাদি হয়। অধর্ম্মকে দুরদৃষ্ট ও পাপ কহে। অধর্ম্ম অবৈধ কর্ম্মানুষ্ঠানে জন্মে এবং প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা বিনষ্ট হয়। ইহা নরকভোগের প্রধান কারণ। ঐ ধর্ম্মাধর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞান হইলে আর জন্মে না, এজন্য তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে বৈধাবৈধ সকল কর্ম্মই সমান বলিয়া পরিগণিত হয়।

শব্দ দ্বিবিধ, ধ্বনি আর বর্ণ। মৃদঙ্গাদি দ্বারা যে শব্দ জন্মে তাহাকে ধ্বনি এবং কণ্ঠাদি হইতে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহাকে বর্ণ কহে। ঐ বর্ণাত্মক শব্দ স্বর ব্যঞ্জন ভেদে দ্বিবিধ। শব্দ অনিত্য হইলেও "সোঽয়ং কঃ" (সেই ক-ই এই) এইরূপ পূর্ব্বোৎপন্ন ককারের সহিত পরোৎপন্ন ককারের যে অভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা বাস্তবিক অভেদ সিদ্ধ হইবেক না। যেমত, যে ঔষধ পান করিয়া নীলমণি আরোগ্য প্রাপ্ত

হইয়াছেন তুমি সেই ঔষধ পান কর ইত্যাদি স্থলে সেই ঔষধের সজাতীয় ঔষধে সেই ঔষধ পান কর ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য বলিতে হয়; সেইরূপ সেই ক সজাতীয় এই ক, এইরূপ অর্থে "সোঽয়ং কঃ" ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য স্বীকার করিতে হইবে।

গুণপদার্থ দ্রব্যমাত্রে থাকে আর কোন পদার্থে থাকে না। তন্মধ্যে নীল পীতাদি রূপ, কটু কষায়াদি রস, গন্ধ, অনুষ্ণাশীত স্পর্শ, সংখ্যা অবধি অপরত্ব পর্য্যন্ত সাতটী, ভাবনা ভিন্ন সংস্কার, গুরুত্ব আর দ্রবত্ব, এই কএকটী গুণ পৃথিবীতে আছে। শুক্লরূপ, মধুর রস, শীতস্পর্শ, সংখ্যাদি অপরত্ব পর্য্যন্ত কএকটী, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ ও বেগ জলের গুণ। এ স্থলে আপাততঃ এরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, যদি জলের শুক্লরূপ ও মধুর রস ব্যতিরিক্ত অন্য রূপ বা রস না থাকে, তবে যমুনার জলে নীলত্ব ও সমুদ্রজলে লবণরসের অনুভব হয় কেন! কিন্তু ঐ আপত্তি স্থূলদর্শীদিগেরই রমণীয় বলিতে হইবে; যেহেতু যমুনাজলেরও শুক্লরূপ আছে ইহা ঐ জলকে উৎক্ষেপণ করিলে স্পষ্ট লক্ষিত হয় এবং সমুদ্রজলে লবণরূপ পার্থিব ভাগ মিশ্রিত থাকায় উহাতে লবণরসের উপলব্ধি হয়, বাস্তবিক জলের লবণ রস নাই; দেখ, যন্ত্রদ্বারা সমুদ্রজল হইতে লবণভাগকে পৃথক্‌ভূত করিলে আর সমুদ্রজলে লবণরসের অনুভব হয় না। যদি বাস্তবিক সমুদ্রজলের লবণ রস থাকিত, তবে কখনই তাহার বিগম হইত না।

জলের মাধুর্য্য গুণ হরীতকী ভক্ষণ করিয়া জল পান করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ঐ মাধুর্য্যগুণ হরীতকীর বলা যাইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে কেবল হরীতকী ভক্ষণ

করিলে তদ্বিপরীত কষায় রসের অনুভব হইত না। শীতস্পর্শ জল ভিন্ন আর কুত্রাপি নাই, তবে যে ঘৃষ্ট চন্দনাদিতে শৈত্যো-পলব্ধি হয়, সে তৎসংযুক্ত জলীয়ভাগের বলিতে হইবে, বাস্ত-বিক যদি চন্দনেরই শৈত্যগুণ থাকিত, তবে শুষ্ক চন্দনেও শৈত্যোপলব্ধি হইত। সকল জলেরই শীতস্পর্শ আছে; তপ্ত জলের যে উষ্ণতা প্রতীতি হয়, সে তৎসংযুক্ত অদৃশ্য তেজের বলিতে হইবে; জলের হইলে অগ্নিসংযোগব্যতি-রেকেও উহাতে উষ্ণতার প্রতীতি হইত। সকল জলেই দ্রবত্বগুণ আছে; করকাদিতে যে কাঠিন্য বোধ হইয়া থাকে সে (উহার দ্রবত্ব প্রতিরুদ্ধ থাকায়) ভ্রম মাত্র। যখন জল ভিন্ন অন্য কোন বস্তু দ্বারা গোধূমচূর্ণ প্রভৃতিকে ম্রক্ষণ করিয়া গোলাকৃতি করা যায় না, তখন এক মাত্র জলেরই যে স্নেহ গুণ আছে তাহা বলা বাহুল্য।

ভাস্বর শুক্ল রূপ, উষ্ণ স্পর্শ, সংখ্যাদি সাতটী ও * দ্রবত্ব এই কএকটী গুণ তেজঃপদার্থে আছে। সুবর্ণ ও মরকত মণি প্রভৃতিরও শুক্লরূপ আছে, তবে যে পীতত্ব ও নীল-ত্বাদির অনুভব হয়, সে কেবল তৎসংযুক্ত পীত নীলাদি পৃথিবীভাগেরই বলিতে হইবে, উহাদিগের শুক্লরূপ তদ্দ্বারা অভিভূত থাকায় দৃষ্ট হয় না। স্বর্ণের শুক্লরূপ উহা দ্রবীভূত হইলে স্পষ্ট প্রতীত হয়। এবং চন্দ্রকিরণাদিতে যে শীত-স্পর্শের অনুভব হয়, তাহাও তন্মিশ্রিত জলীয় ভাগের বলিতে হইবে, যেহেতু সকল তেজেরই উষ্ণস্পর্শ আছে। স্বাভাবিক অনুষ্ণাশীত স্পর্শ, সংখ্যা প্রভৃতি সাতটী আর বেগ, বায়ুর

* যদিও এস্থলে সামান্যতঃ তেজের গুণ লিখিত হইল, তথাপি সকল তেজের দ্রবত্ব গুণ নাই, স্বর্ণ প্রভৃতির আছে, অগ্নিপ্রভৃতির নাই।

গুণ। বায়ুর যে কখন কখন উষ্ণতা ও শৈত্যের উপলব্ধি হয়, সে বায়ুকর্তৃক আনীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৈজস ও জলীয় ভাগের বলিতে হইবে; যেহেতু বায়ুর, পুষ্করিণ্যাদির নিকটেই শৈত্যের এবং দহনাদির নিকটেই উষ্ণতার অনুভব হয়। যদি বায়ুর স্পর্শই ঐ ঐ রূপ হইত, তবে সর্ব্বদাই ঐ ঐ রূপ স্পর্শের উপলব্ধি হইত।

শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই কয়েকটী গুণ আকাশে আছে। কাল আর দিকের গুণ সংখ্যাদি পাঁচটী। সংখ্যাদি পাঁচটী, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, ভাবনাত্মক সংস্কার, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, এই চৌদ্দটী গুণ জীবাত্মার; জীবাত্মার যে যে গুণ আছে, প্রায় সে সকলই পরমাত্মার আছে, কেবল দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, ভাবনা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই কয়েকটী নাই। পরমাত্মার জ্ঞান, ইচ্ছা, যত্ন প্রভৃতি কএকটী গুণ নিত্য। সংখ্যাদি সাতটী আর বেগ মনের গুণ।

ক্রিয়াকে কর্ম্ম কহে। কর্ম্মপদার্থ উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন ভেদে পঞ্চবিধ।

ঊর্দ্ধ প্রক্ষেপকে উৎক্ষেপণ, অধোবিক্ষেপকে অবক্ষেপণ, বিস্তৃত বস্তু সকলের সঙ্কোচ করাকে আকুঞ্চন, আর সঙ্কুচিত বস্তু সকলের বিস্তার করাকে প্রসারণ কহে। ভ্রমণ, ঊর্দ্ধজ্বলন, তির্য্যগ্গমন প্রভৃতির গমনেই অন্তর্ভাব হইবে, ইহারা স্বতন্ত্র ক্রিয়া নহে। ক্রিয়া পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু আর মনঃ এই পাচটী দ্রব্যে থাকে।

জাতি পদার্থ নিত্য এবং অনেক বস্তুতে থাকে, যথা ঘটত্ব জাতি সকল ঘটেই আছে। পর ও অপর ভেদে জাতি

দ্বিবিধ। যে জাতি অধিক স্থানে থাকে তাহাকে পর জাতি, আর যাহা অল্প দেশে থাকে তাহাকে অপর জাতি কহে। দেখ, সত্তা জাতি দ্রব্য, গুণ আর ক্রিয়া তিনেই আছে বলিয়া উহাকে পরজাতি এবং ঘটত্ব ও নীলত্বাদি জাতি কেবল ঘটে ও কেবল নীলাদিতে থাকায় উহাদিগকে অপর জাতি কহে। দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও ক্রিয়াত্বাদি জাতি সত্তা অপেক্ষা অল্পদেশে থাকায় অপর জাতি, আর ঘটত্বাদি অপেক্ষা অধিক স্থানে থাকায় পর জাতি, অপর জাতি উভয়ই হইতে পারে।

বিশেষ পদার্থ নিত্য। আকাশ ও পরমাণু প্রভৃতি এক একটী নিত্যদ্রব্যে এক একটী বিশেষ পদার্থ আছে। যদি বিশেষ পদার্থ না থাকিত, তবে কখনই পরমাণু সকলের পরস্পর বিভিন্নরূপতার নিশ্চয় করা যাইত না। দেখ যেমত অবয়বী বস্তুদ্বয়ের পরস্পরের অবয়বগত বিভিন্নতা দর্শনে বিভিন্ন-রূপতা নিশ্চয় করা যাইতেছে, সেরূপ পরমাণু-প্রভৃতির ত অবয়ব নাই, তবে কি রূপে তাহাদিগের বিভিন্নতা নিশ্চয় করা যাইতে পারে? কিন্তু বিশেষ পদার্থ স্বীকার করিলে এরূপ দোষ হয় না। কারণ তাহা হইলে, এই পরমাণুতে যে বিশেষ আছে, তাহা অন্য পরমাণুতে নাই বলিয়া এই পরমাণু অন্য পরমাণু হইতে ভিন্ন, এবং অন্য পরমাণুতে যে বিশেষ আছে তাহা অপর পরমাণুতে নাই, এজন্য অন্য পরমাণু অপর পরমাণু হইতে পৃথক্—এই রীতি ক্রমে যাবতীয় পরমাণুর পরস্পর বিভিন্নরূপতা নিশ্চয় করা যাইতে পারে।

দ্রব্যের সহিত গুণ ও কর্ম্মের, দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সহিত জাতির, নিত্য দ্রব্যের সহিত বিশেষ পদার্থের যে সম্বন্ধ

এবং অবয়বের সহিত অবয়বীর যে সম্বন্ধ, তাহাকে সমবায় পদার্থ* কহে। যেরূপ হস্তের সহিত পুস্তকের সম্বন্ধ পুস্তক হইতে হস্ত উত্তোলন করিলে থাকে না, সমবায় সম্বন্ধ সেরূপ নহে, যেহেতু দ্রব্যত্বের সম্বন্ধ ব্যতিরেকে কখনই দ্রব্য থাকে না এবং অবয়বের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া কখনই অবয়বী থাকে না। অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, সমবায় সম্বন্ধ সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে। এজন্য উহাকে নিত্য সম্বন্ধ কহে।

অভাব দ্বিবিধ; ভেদ ও সংসর্গাভাব। গৃহ হইতে পুস্তক ভিন্ন, পুস্তক গৃহ নহে, লেখনীতে ঘটের ভেদ আছে ইত্যাদি স্থলে যে অভাব প্রতীয়মান হয়, তাহাকে ভেদ কহে। অত্যন্তাভাব, ধ্বংস ও প্রাগভাব ভেদে সংসর্গাভাব ত্রিবিধ। এ গৃহে বস্ত্র নাই, নীলকমল তুমি গৃহে গমন করিও না, অদ্য আমার অধ্যয়ন হইল না ইত্যাদি স্থলে যে অভাব বুঝায় তাহাকে অত্যন্তাভাব কহে। অত্যন্তাভাব আর ভেদের উৎপত্তি বা বিনাশ কিছুই নাই। যে বস্তুর যাহাতে উৎপত্তি হইবে সে বস্তুর তাহাতে পূর্ব্বে যে অভাব থাকে তাহাকে প্রাগভাব কহে। এই সূত্রে বস্ত্র হইবে এবং এই স্বর্ণে অলঙ্কার হইবে ইত্যাদি স্থলে ঐ অভাব প্রতীয়মান হয়। প্রাগভাবের উৎপত্তি নাই বটে, কিন্তু বিনাশ আছে। দেখ, যত ক্ষণ সূত্রে বস্ত্র না হয় তত ক্ষণ সূত্রে বস্ত্রের প্রাগভাব থাকে বটে, কিন্তু বস্ত্র হইলেই উহা আর থাকে না বিনষ্ট হইয়া যায়। বিনাশকে ধ্বংস কহে। যখন ঘট বিনষ্ট

* এই মতে সমবায় পদার্থের প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু নৈয়ায়িকেরা ইহার প্রত্যক্ষ স্বীকার করিয় থাকেন।

হইবে, বস্ত্র ধ্বস্ত হইতেছে, আমার পক্ষীটি বহুকাল বিনষ্ট হইয়াছে, এরূপ ব্যবহারদ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, ধ্বংসেরও উৎপত্তি আছে; তখন ধ্বংসের যে উৎপত্তি নাই এই কথায় কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে, কিন্তু "ধ্বংসের ধ্বংস হইবে বা হইতেছে" এরূপ ব্যবহার হইতেছে না বলিয়া ধ্বংসের যে ধ্বংস নাই ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে।

এই সপ্ত পদার্থাতিরিক্ত পদার্থান্তর নাই। ইহাদিগের মধ্যেই তাবৎ পদার্থ অন্তর্ভূত হইবে। অন্ধকারাদি স্বতন্ত্র পদার্থ নহে; যেহেতু আলোকের অভাবকেই অন্ধকার কহে। তদতিরিক্ত অন্ধকার পদার্থে কোন প্রমাণ নাই; তবে যে "নীলং তমশ্চলতি" (অর্থাৎ নীলবর্ণ অন্ধকার চলিতেছে) এরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে তাহা ভ্রমাধীন বলিতে হইবে; যেহেতু অভাব পদার্থের নীলগুণ ও চলনক্রিয়া সম্ভবে না। সকল পদার্থকেই জানিতে ও শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করিতে এবং প্রমাণ সিদ্ধ করিতে পারা যায় বলিয়া সকল পদার্থকেই জ্ঞেয় বাচ্য ও প্রমেয়রূপে নির্দ্দেশ করা যায়।

অক্ষপাদদর্শন।

এই দর্শনপ্রণেতা মহর্ষির নাম অক্ষপাদ ও গোতম, এজন্য ইহাকে অক্ষপাদ ও গোতম দর্শন কহে। ইহাতে ন্যায় ও তর্ক পদার্থ বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে ইহার ন্যায়শাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্র এই দুইটী নামও অন্বর্থ হইতেছে। এবং এই

দর্শনে অনুমানের রীতি সবিশেষ নিরূপিত থাকায় ইহাকে আন্বীক্ষিকী শাস্ত্র বলিয়াও ব্যবহার করিয়া থাকে *। এই ন্যায় শাস্ত্রের সকল শাস্ত্রেই উপযোগিতা আছে, যে হেতু ন্যায় শাস্ত্র ব্যতিরেকে কোন শাস্ত্রেরই যথার্থ তাৎপর্য্যগ্রহ হয় না। ভগবান্ বৃহস্পতিও কহিয়াছেন, "যে ব্যক্তি তর্কশাস্ত্রানুসারে তাৎপর্য্যার্থের অনুসন্ধান করে, সে ব্যক্তিই শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া ধর্ম্মনির্ণয়ে সমর্থ হয়। কেবল শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম বিচার করা অকর্ত্তব্য, যে হেতু ন্যায় স্বরূপ যুক্তি-বিহীন বিচারে ধর্ম্ম হানি হয়।" পক্ষিলস্বামী কহিয়াছেন "এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যা সকল বিদ্যার প্রদীপ স্বরূপ, যাবতীয় কর্ম্মের উপায় এবং নিখিল ধর্ম্মের আশ্রয়"। আর যখন মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্মোপায়ে স্বয়ং বেদব্যাসই লিখিয়াছেন "হে বৎস পার্থিব! আমি আন্বীক্ষিকী শাস্ত্র অবলোকন করিয়া উপনিষদের সার সংগ্রহ করিয়াছি"। তখন ন্যায়মতানুসারী উপনিষদের অর্থই গ্রাহ্য ও শ্রদ্ধেয় ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হই-তেছে। এ স্থলে অন্যায়পথাবলম্বী কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন যে, ন্যায়মতানুসারে কি রূপে উপনিষদের অর্থগ্রহণ করা যাইতে পারে, যেহেতু "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি অনেকানেক ন্যায়বিরুদ্ধ শ্রুতি আছে। কিন্তু আদ্যোপান্ত বৌদ্ধাধিকারবিবৃতি দর্শন করিলে ঐ আপত্তি কেবল অবোধ-বিলসিত বোধ হইবে, যেহেতু উক্ত গ্রন্থে মহামহোপাধ্যায় রঘুনাথ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য ঐ সকল শ্রুতির সমন্বয় করি-

* অনু শ্রবণাদনু,+ঈক্ষা (মননম্)=অন্বীক্ষা, তন্নির্ব্বাহিকা আন্বীক্ষিকী, অর্থাৎ আত্মতত্ত্বের শ্রবণানন্তর তাহার অনুমানরূপ মননের নির্ব্বাহক শাস্ত্র।

য়াছেন। তাহা অবলোকন করিলে ন্যায়মতানুসারে শ্রুত্যর্থ সংগ্রহ করাই ন্যায্য বোধ হইবে।

গোতম প্রণীত এই ন্যায়শাস্ত্র পঞ্চাধ্যায়াত্মক। ঐ পাঁচটী অধ্যায়েই দুই দুইটী আহ্নিক আছে এবং সকল আহ্নিকই প্রকরণাত্মক। যদিও, কোন আহ্নিকে চারিটী, কোন আহ্নিকে আটটী, আর কোন আহ্নিকে বা তদধিক প্রকরণ থাকায় প্রকরণের বিশেষরূপ নিয়ম নাই বটে; কিন্তু কোন আহ্নিকেই চারিটির ন্যূন আর সতরটির অধিক প্রকরণ নাই, এরূপ সামান্য নিয়ম আছে। প্রথমাধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে প্রমাণাদি নয়টী পদার্থের লক্ষণ এবং দ্বিতীয়াহ্নিকে বাদ হইতে নিগ্রহস্থান পর্য্যন্ত সাতটী পদার্থের লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয়ের প্রথমে সংশয় পরীক্ষা * এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ চতুষ্টয়ের অপ্রামাণ্য শঙ্কা নিরাকরণ। দ্বিতীয়ে অর্থাপত্তিপ্রমাণপ্রভৃতির অনুমানে অন্তর্ভাব; তৃতীয়ের প্রথমে আত্মপ্রভৃতি অর্থপর্য্যন্ত চারিটী প্রমেয় পদার্থের পরীক্ষা, দ্বিতীয়ে বুদ্ধি ও মনের পরীক্ষা, চতুর্থের প্রথমে প্রবৃত্তি অবধি অপবর্গ পর্য্যন্ত ছয়টী প্রমেয় পদার্থের পরীক্ষা, দ্বিতীয়ে তত্ত্বজ্ঞান পরীক্ষা; পঞ্চমের প্রথমে জাতিপদার্থবিভাগ, দ্বিতীয়ে নিগ্রহস্থান বিভাগ নিরূপিত হইয়াছে।

এই মতে পদার্থ ষোল প্রকার; প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়,

* কোন বিষয় স্বীকার করিতে যে যুক্তি উপন্যাস করা যায় তাহাকে তাহার পরীক্ষা কহে। অতিরিক্ত সংশয় পদার্থ স্বীকার করিবার যুক্তিকে সংশয় পরীক্ষা কহে।

বাদ, জল্প, বিতণ্ডা হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান।

যাহার দ্বারা যথার্থরূপে বস্তু সকলের নির্ণয় করা যায় তাহাকে প্রমাণ পদার্থ কহে। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দভেদে প্রমাণ চারি প্রকার। ঐ চারিটী প্রমাণদ্বারা যথাক্রমে প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি আর শাব্দবোধ— এই চারিটী প্রমিতি জন্মে। নয়নাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যথার্থরূপে বস্তু সকলের যে জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমিতি কহে। প্রত্যক্ষ প্রমিতি ছয় প্রকার; ঘ্রাণজ, রাসন, চাক্ষুব, ত্বাচ, শ্রাবণ ও মানস। ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষুঃ, ত্বক্, শ্রোত্র আর মনঃ—এই ছয়টি ইন্দ্রিয় দ্বারা যথাক্রমে উল্লিখিত ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ জন্মে। গন্ধ, ও তদ্গত সুরভিত্ব ও অসুরভিত্বাদি জাতির ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ হয়। মধুরাদি রস ও তদ্গত মধুরত্বাদি জাতির রাসন, নীল পীতাদি রূপ, ঐ ঐ রূপবিশিষ্ট দ্রব্য নীলত্ব, পীতত্ব প্রভৃতি জাতি, ঐ ঐ রূপবিশিষ্ট দ্রব্যের ক্রিয়া এবং যোগ্যবৃত্তি সমবায়াদির চাক্ষুষ, উদ্ভূত শীত উষ্ণাদি স্পর্শ ও তাদৃশ স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যাদির * ত্বাচ, শব্দ ও তদ্গত বর্ণত্ব, ধ্বনিত্বাদি জাতির শ্রাবণ, এবং সুখদুঃখাদি আত্মবৃত্তি গুণের, আত্মার ও সুখত্বাদি জাতির মানস প্রত্যক্ষ † হয়।

ব্যাপ্য পদার্থ দর্শন করিয়া ব্যাপক পদার্থের যে

* বল্লভাচার্য্যমতে গুরুত্বেরও স্পার্শন প্রত্যক্ষ হয়। নব্যেরা বায়ু ও তদ্গত কোন কোন সংখ্যার স্পার্শন প্রত্যক্ষ স্বীকার করিয়া থাকেন।

† বাচস্পতিমিশ্রমতে আত্মার পরিমাণ ও একত্ব সংখ্যার মানস প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

জ্ঞান হয় তাহাকে অনুমিতি কহে। যে পদার্থ থাকিলে যে পদার্থের অভাব না থাকে তাহাকে তাহার ব্যাপ্য, এবং যে পদার্থ না থাকিলে যে পদার্থ না থাকে তাহাকে তাহার ব্যাপক কহে; যথা কোন স্থানেই বহ্নি ব্যতিরেকে ধূম থাকে না বলিয়া ধূন বহ্নির ব্যাপ্য, এবং যে স্থানে ধূম থাকে সে স্থানে বহ্নির অভাব থাকে না বলিয়া বহ্নি ধূমের ব্যাপক। এইজন্য লোকে পর্ব্বতাদিতে ধূম সন্দর্শন করিয়া বহ্নির অনুমান করিয়া থাকে। অনুমান ত্রিবিধ; পূর্ব্ববৎ শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট। কারণ দর্শনে কার্য্যের অনুমানকে পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ "কারণলিঙ্গক" অনুমান কহে, যেমন মেঘের উন্নতি দর্শন করিয়া বৃষ্টির অনুমান। কার্য্য দর্শন করিয়া কারণের অনুমানকে শেষবৎ অর্থাৎ "কার্য্যলিঙ্গক" অনুমান কহে, যেমন নদীর অত্যন্ত বৃদ্ধি দর্শন করিয়া বৃষ্টির অনুমান। কারণ ও কার্য্যভিন্ন কেবল ব্যাপ্য যে বস্তু তাহাকে দর্শন করিয়া যে অনুমিতি হয় তাহাকে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান কহে, যথা গগনমণ্ডলে সম্পূর্ণ শশধর সন্দর্শনে শুক্ল-পক্ষের অনুমান ক্রিয়াকে হেতু করিয়া গুণের অনুমান এবং পৃথিবীত্ব জাতিকে হেতু করিয়া দ্রব্যত্ব জাতির অনুমান।

কোন কোন শব্দের কোন কোন অর্থে শক্তি পরিচ্ছেদকে উপমিতি কহে। যথা, যে ব্যক্তি পূর্ব্বে গবয় জন্তু সন্দর্শন করে নাই, কিন্তু শুনিয়াছে, গোসদৃশ গবয়পদবাচ্য, অর্থাৎ যে বস্তুর আকৃতি অবিকল গোর আকৃতিতুল্য, গবয় শব্দে তাহাকে বুঝায়, সেই ব্যক্তি তৎকালে এই মাত্র জানে যে, যে জন্তু গোসদৃশ হইবে গবয় শব্দে তাহাকেই বুঝাইবে, গবয়শব্দ

দ্বারা গবয় জন্তু বুঝায় জানে না। কিন্তু যখন সেই ব্যক্তির নয়ন পথে গবয় জন্তু পতিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি ঐ গবয়ের আকৃতি গোর আকৃতিতুল্য দেখিয়া এবং পূর্ব্বশ্রুত গোসদৃশ গবয় পদবাচ্য এই বাক্যের স্মরণ করিয়া বিবেচনা করে, যদি গোসদৃশ জন্তুকে গবয় শব্দে বুঝায় তবে যখন এই জন্তুটী গোসদৃশ হইতেছে, তখন এই জন্তুই গবয় পদবাচ্য হইবে সন্দেহ নাই। এস্থলে "এই জন্তুই গবয় পদবাচ্য হইবে" এইরূপ গবয় শব্দের শক্তি পরিচ্ছেদকে উপমিতি কহে।

শব্দ দ্বারা যে বোধ হয় তাহাকে শাব্দবোধ কহে। যেমন গুরুর উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ছাত্রগণের উপদিষ্ট অর্থের শাব্দবোধ জন্মে। শব্দ প্রমাণ দ্বিবিধ; দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক। যে শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধ তাহাকে দৃষ্টার্থক, আর যাহার অর্থ অদৃশ্য তাহাকে অদৃষ্টার্থক শব্দ কহে। ইহার উদাহরণ যথাক্রমে, তুমি গৌরবর্ণ, আমার পুস্তক অতি উত্তম, তুমি দেখ ইত্যাদি সিদ্ধার্থক বাক্য, আর যাগ করিলে স্বর্গ হয়, বিষ্ণুপূজা করিলে বিষ্ণুর সন্তোষ জন্মে ইত্যাদি বিধি বাক্য।

প্রমেয় পদার্থ আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মনঃ, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গভেদে দ্বাদশ প্রকার। * ইন্দ্রিয় দুই প্রকার; বহিরিন্দ্রিয় আর অন্তরিন্দ্রিয়।

* অক্ষপাদ দর্শনের সহিত ঔলূক্য দর্শনের অনেকাংশে ঐকমত্য আছে। সুতরাং যে যে পদার্থ ঔলূক্য দর্শনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তৎসমুদায় এবং প্রসিদ্ধ পদার্থ সকলের লক্ষণ বা উদাহরণাদি প্রদর্শন করা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায় এস্থলে আত্মা ও শরীর পদার্থ প্রভৃতির লক্ষণাদি প্রদর্শিত হইল না এবং উত্তরোত্তর সংশয় পদার্থ প্রভৃতিও লক্ষিত হইবে না।

ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষুঃ, ত্বক ও শ্রোত্র ভেদে বহিরিন্দ্রিয় পাঁচ প্রকার। অন্তরিন্দ্রিয় এক মাত্র মনঃ। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দভেদে অর্থ পদার্থ পাঁচ প্রকার। দোষ পদার্থ রাগ, দ্বেষ ও মোহ ভেদে ত্রিবিধ। কাম, মৎসর, স্পৃহা, তৃষ্ণা, লোভ, মায়া ও দম্ভাদি ভেদে রাগ পদার্থ নানাবিধ। রমণেচ্ছাকে কাম কহে। নিজ প্রয়োজন ব্যতিরেকেই পরের অভিমত বিষয়ের নিবারণেচ্ছাকে মৎসর কহে, যেমন জলপানার্থ রাজকীয় পুষ্করিণীর অভিমুখে গমনোদ্যত তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে উদাসীন ব্যক্তির নিবারণেচ্ছা। পরগুণের নিবারণেচ্ছাকেও মৎসর কহে। যে বিষয়ে কোন ধর্ম্মের হানি না হয় এমত বিষয় প্রাপ্তির ইচ্ছাকে স্পৃহা, আর আমার সঞ্চিত বস্তুর ক্ষয় না হউক এতাদৃশ ইচ্ছাকে তৃষ্ণা কহে। কার্পণ্যাদি-ভেদে তৃষ্ণাও নানাবিধ। উচিত ব্যয় না করিয়া ধনরক্ষ-ণেচ্ছাকে কার্পণ্য কহে। যাহার দ্বারা পাপ হইতে পারে এমত বিষয়ের প্রাপ্তীচ্ছাকে লোভ কহে। পরবঞ্চনেচ্ছাকে মায়া কহে। ছলক্রমে নিজের ধার্ম্মিকত্বাদি প্রকাশ করিয়া স্বকীয় উৎকৃষ্টত্ব ব্যবস্থাপনেচ্ছাকে দম্ভ কহে।

ক্রোধ, ঈর্ষা, অসূয়া, দ্রোহ, অমর্ষ ও অভিমানাদি ভেদে দ্বেষও নানাপ্রকার। নেত্রাদির রক্ততাদিজনক দ্বেষকে ক্রোধ ও সাধারণ ধনাদি হইতে নিজাংশগ্রাহী এক অংশীর প্রতি অপর অংশীর যে দ্বেষ হয় তাহাকে ঈর্ষা কহে, যেমন দুরন্ত দায়াদগণের পরস্পর দ্বেষ। পরগুণাদিতে যে বিদ্বেষ তাহাকে অসূয়া, প্রাণীবিনাশজনক দ্বেষকে দ্রোহ, দুর্দ্দান্ত অপকারীর প্রতি প্রত্যপকারাসমর্থ ব্যক্তির দ্বেষকে অমর্ষ, এবং তাদৃশ অপকারীর অপকার করিতে না পারিয়া

"ধিক্ আমার আর জীবন ধারণ করা বৃথা! যেহেতু আমার অপকারীর অপকার করিবার ক্ষমতা নাই" এইরূপ আত্মাবমাননাকে অভিমান কহে।

বিপর্য্যয়, সংশয়, তর্ক, মান, প্রমাদ, ভয়, শোকাদিভেদে মোহও নানাপ্রকার। অযথার্থ নিশ্চয়কে বিপর্য্যয় কহে, যেমন রজ্জুকে সর্প বলিয়া নিশ্চয় করা। যে যে গুণ বাস্তবিক নিজের নাই সেই সকল গুণ নিজে আরোপ করিয়া আপনাকে উৎকৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান করাকে মান, এক বিষয়কে পূর্ব্বে কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া ক্ষণকাল পরেই পুনরায় তাহাকেই অকর্ত্তব্য বলিয়া নিশ্চয় করাকে অর্থাৎ (মতির অস্থিরতাকে) প্রমাদ কহে। অনিষ্টজনক কোন ব্যাপার উপস্থিত হইলে তৎপ্রতীকারে নিজের অসামর্থ্যজ্ঞানকে ভয় আর ইষ্টবস্তুর বিয়োগ হইলে পুনরায় তাহার অপ্রাপ্তিসম্ভাবনাকে শোক কহে।

বারংবার উৎপত্তিকে অর্থাৎ একবার মরণ আর একবার জন্মগ্রহণ এবং পুনরায় মরণ ও তদনন্তর জন্মগ্রহণরূপ জন্মগ্রহণের আবৃত্তিকে প্রেত্যভাব কহে। যত দিন না মুক্তি হয় তত দিন সকল জীবগণকেই এই প্রেত্যভাব দুঃখে দুঃখিত হইতে হয়।

যাহার দ্বারা যাহা নিষ্পন্ন হয় তাহার ফল তাহাকে কহে, যেমন রন্ধনের ফল অন্ন, শাস্ত্রানুশীলনের ফল জ্ঞানোদয়। ফল পদার্থ মুখ্য ও গৌণভেদে দ্বিবিধ। চরম ফলকে মুখ্যফল কহে, মুখ্য ফল সুখ ও দুঃখের ভোগ। এতদতিরিক্ত সকল ফলই গৌণ ফল। যেহেতু সকল কর্ম্মেরই চরমে সুখ বা দুঃখের ভোগ স্বরূপ ফল পর্য্যবসন্ন হয়। দেখ, রন্ধন দ্বারা

পরিশেষে ভোজন জন্য তৃপ্তিরূপ সুখ ও শাস্ত্র আলোচনা করিয়া জ্ঞানোদয় হইলে অসীম বিদ্যানন্দরূপ সুখের ভোগ হয়; আর চৌর্য্যাদি দোষে দূষিত হইয়া পরিশেষে পিঞ্জরস্থ পক্ষীর ন্যায় কারাবদ্ধ হইয়া অশেষ যন্ত্রণা স্বরূপ দুঃখের ভোগ হয়; এই রূপে বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, সকল কর্ম্মেরই চরম ফল সুখ-ভোগ কিম্বা দুঃখ-ভোগ।

অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তিরূপ মুক্তিকে অপবর্গ কহে। যে বিষয়ের উদ্দেশে যে ব্যক্তি যে বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, সেই বিষয়কে সেই ব্যক্তির সে বিষয়ে প্রবৃত্তির প্রয়োজন কহে। যেমন বুভুক্ষু ব্যক্তির রন্ধন প্রয়োজন ভোজন এবং সুপকারের বেতন। এস্থলে এমত আশঙ্কা করিও না যে, ঐ ঐ ব্যক্তিদিগের ভোজন ও বেতন গ্রহণাদি যেমন রন্ধনের প্রয়োজন হই- তেছে সেরূপ রন্ধনের ফল স্বরূপও হইতেছে, তবে প্রয়ো- জন পদার্থ ও ফল পদার্থ পৃথক্ নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন কি! যেহেতু এস্থলে ঐ উভয় পদার্থের ঐক্য থাকিলেও কুপিত ফণিফণাস্থ মণির আশয়ে ফণায় হস্তক্ষেপাদির স্থলে ঐ উভয়ের বিভিন্নতা আছে। ঐ স্থলে মণির আশয়ে ফণায় হস্ত নিক্ষেপ করিবার প্রয়োজন মণি, এবং ফল সর্পকৃত দংশন দ্বারা প্রাণ বিয়োগ। যেহেতু যে বিষয়ের আশয়ে প্রবৃত্তি জন্মে তাহা সিদ্ধ হউক বা না হউক তাহাকে প্রয়ো- জন, আর অভিপ্রেত হউক বা অনভিপ্রেতই হউক যে বিষয় যাহার দ্বারা নিষ্পন্ন হয় তাহাকে তাহার ফল কহে ইহা পূর্ব্বে প্রায় উক্তই হইয়াছে।

প্রয়োজন মুখ্য ও গৌণভেদে দ্বিবিধ। অভিলষণীয় বিষয়ান্তরের সম্পাদক বলিয়া যে বিষয় অভিলষণীয় হয়

তাহাকে গৌণ, আর তদতিরিক্ত কেবল অভিলষণীয় বিষয়কে মুখ্য প্রয়োজন কহে। মুখ্য প্রয়োজন সুখ ও দুঃখনিবৃত্তি। যে কোন ব্যক্তি যে কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় সকলেরই প্রধান উদ্দেশ্য সুখ বা দুঃখনিবৃত্তি, ঐ সুখ ও দুঃখনিবৃত্তির সম্পাদক বলিয়াই অতি ক্লেশকর বিষয়ও প্রার্থনীয় হয়। দেখ যদি ধনাদি দ্বারা ঐহিক সুখ স্বচ্ছন্দতা ও যজ্ঞাদির দ্বারা পারলৌকিক স্বর্গসুখ লাভ না হইত, তবে কোন ব্যক্তিই শারীরিক ক্লেশাদি স্বীকার করিয়া ধনোপার্জ্জন ও যজ্ঞাদিতে প্রবৃত্ত হইত না। অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ ঐ সুখলাভের আশয়েই ঐ ঐ বিষয়ে লোকে প্রবৃত্ত হয়। এবং যদি ঔষধ সেবন করিলেও শারীরিক পীড়া নিবৃত্তি না হইত অথবা যোগাভ্যাস করিলেও মুক্তি না হইত, তবে কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দৃষ্ট দুঃখজনক ঐ ঐ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইত! কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তি জানে ঔষধ পান করিলে পীড়া শান্তি হয় অথবা যোগাভ্যাস করিলে মুক্তি হয়, সেই ব্যক্তিই ঐ ঐ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, আর যে ব্যক্তি তাহা না জানে কিংবা তদ্বিষয়ে যাহার বিশ্বাস না জন্মে, সেই ব্যক্তি ঐ ঐ বিষয়ে কদাচ প্রবৃত্ত হয় না; * তখন ঔষধ পান ও যোগাভ্যাসের প্রধান উ-দ্দেশ্য যে অনুক্রমে পীড়াশান্তিরূপ শারীরিক দুঃখনিবৃত্তি ও মুক্তিস্বরূপ অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি তাহার আর সন্দেহ কি। ফলতঃ সকল বিষয়েরই প্রধান উদ্দেশ্য সুখ বা দুঃখনিবৃত্তি ব-লিয়া সুখ ও দুঃখনিবৃত্তিকে মুখ্য প্রয়োজন আর উহারদিগের সাধন বলিয়া ধনোপার্জ্জনাদিকে গৌণ প্রয়োজন কহে।

* ইহার উদাহরণ যথাক্রমে বালক ও নাস্তিকগণ।

প্রকৃত বিষয়ের দৃঢ়ীকরণার্থ যে প্রসিদ্ধ স্থলের উপন্যাস করা যায়, সেই স্থলকে দৃষ্টান্ত কহে। যথা "এই পর্ব্বতে বহ্নি আছে, যেহেতু ধূম দেখা যাইতেছে, যে যে স্থলে ধূম থাকে সেই সেই স্থলেই বহ্নি থাকে, যেমন রন্ধনশালা" এস্থানে "যেমন রন্ধনশালা" এই অংশটীকে দৃষ্টান্ত কহে।

অনিশ্চিত বিষয়ের শাস্ত্রানুসারে নির্ণয় করাকে সিদ্ধান্ত কহে; যথা, কি হইলে মুক্তি হয় এই রূপ জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে "তত্ত্বজ্ঞানান্নিশ্রেয়সাধিগমঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হইলে মুক্তি হয় এইরূপ নিশ্চয় করা। সিদ্ধান্ত চারিপ্রকার; সর্ব্বতন্ত্র, প্রতিতন্ত্র, অধিকরণ আর অভ্যুপগম। যে বিষয় সকল শাস্ত্রেই স্বীকৃত হইয়াছে এমত বিষয়ের স্বীকারকে সর্ব্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত কহে, যেমন পরধনাপহরণ, পরস্ত্রীসংসর্গ ও পরের দ্বেষ সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য আর দীনের প্রতি দয়া, পরগুণে সন্তোষ ও পরোপকার প্রভৃতি সৎকর্ম্ম সর্ব্বদা করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি স্বীকার করা। যে বিষয় শাস্ত্রান্তর সম্মত নহে এতদ্বিষয়ের স্বকীয় শাস্ত্রে স্বীকারকে প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত কহে; যথা বৈশেষিকদর্শনকর্ত্তার বিশেষ পদার্থ স্বীকার। এক বিষয় স্বীকার করিলে যে, বিষয়ান্তরেরও স্বীকার করা হয় তাহাকে অধিকরণ সিদ্ধান্ত কহে; যথা জগৎ ঈশ্বর নির্ম্মিত বলিয়া স্বীকার করিলে, ঈশ্বরের যে জগন্নির্ম্মাণ ক্ষমতা আছে তাহাও স্বীকার করা হয়, এবং এই কাষ্ঠখানি একশত লোকেও উত্তোলন করিতে পারে না ইহা অঙ্গীকার করিলে ইহাও অঙ্গীকার করা হয় যে এই কাষ্ঠের অতিশয় গুরুতা আছে। কোন বিষয় স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ না করিয়া প্রকারান্তরে সে বিষ-

য়ের স্বীকারকে অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত কহে; যথা ঈশ্বর আছেন কি না তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ না করিয়া এই জগৎ ঈশ্বর-নির্ম্মিত ইত্যাদি কথন দ্বারা ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করা এবং এই ন্যায়সূত্রে মনের ইন্দ্রিয়ত্তা ইন্দ্রিয়গণনাস্থলে উল্লিখিত হয় নাই, কিন্তু স্থলান্তরে মহর্ষি গোতমের মনের ইন্দ্রিয়তা ভঙ্গিক্রমে স্বীকার করা হইয়াছে।

বিচারাঙ্গ বাক্য বিশেষকে অবয়ব কহে। অবয়ব পাঁচটী; প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। যে বিষয়ের ব্যবস্থাপন করিতে হইবে তাহার উপন্যাসকে প্রতিজ্ঞা কহে। যথা পর্ব্বতে বহ্নির সাধনার্থ "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" অর্থাৎ পর্ব্বতে অগ্নি আছে ইত্যাদি বাক্য। কি হেতু পর্ব্বতে বহ্নি আছে এই জিজ্ঞাসা নিরাসার্থ তদনুমাপক হেতুর যে উপন্যাস তাহাকে হেতু কহে; যেমন ঐ স্থলেই "ধূমাৎ" অর্থাৎ ধূম হেতু এই ভাগের উপন্যাস। উদাহরণ দ্বিবিধ অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী। পর্ব্বতে ধূম থাকিলে বহ্নি থাকে কেন? এই আশঙ্কা নিবারণার্থ "যো যো ধূমবান্ স স বহ্নিমান্" অর্থাৎ যে যে স্থানে ধূম থাকে সেই সেই স্থানেই বহ্নি থাকে, যথা রন্ধনশালা, ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগকে অন্বয়ী উদাহরণ, আর পূর্ব্বোক্ত শঙ্কা নিরাকরণার্থ "যন্নৈবং তন্নৈবং" অর্থাৎ যে স্থানে বহ্নি না থাকে সে স্থানে ধূমও থাকে না যথা পুষ্করিণী ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগকে ব্যতিরেকী উদাহরণ কহে। সকল স্থলে উদাহরণ দ্বয়ের উপন্যাস করার আবশ্যকতা নাই, যেহেতু একতরের উপন্যাস করিলেই পূর্ব্বোক্ত শঙ্কা নিরাকরণ হইতে পারে। এই উদাহরণ বাক্য দ্বারা বহ্নিতে ধূমের নিয়ত সহচারিত্ব

রূপ ব্যাপকতা ব্যবস্থাপন করিয়া পক্ষনামক প্রকৃত স্থলে প্রকৃত সাধ্যসাধক হেতুর ব্যবস্থাপনকে উপনয় কহে, যথা "বহ্নিব্যাপ্যধূমবাংশ্চায়ং" অর্থাৎ বহ্নির ব্যাপ্য ধূম এই পর্ব্বতে আছে, এইরূপ বাক্য। আর প্রকৃত পক্ষে প্রকৃত সাধ্যের উপসংহার বাক্যকে নিগমন কহে; যেমত "তস্মাৎ বহ্নিমান্" অর্থাৎ সেইহেতু এই পর্ব্বতে বহ্নি আছে ইত্যাদি বাক্য। যেমত হস্ত, পদ ও উদরাদির প্রত্যেককে শরীরের অবয়ব আর তৎ সমুদায়কে শরীর কহে, সেইরূপ প্রতিজ্ঞাদি ঐ পাঁচটী বাক্যের প্রত্যেককে ন্যায়াবয়ব আর তৎসমুদায়কে ন্যায় বাক্য কহে। সকল বিচারস্থলেই ন্যায় প্রয়োগ করিতে হয়, ন্যায় প্রয়োগ না করিলে কোন পদার্থ সিদ্ধ হয় না। প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ বাক্য ন্যায়ের অবয়ব বলিয়াই উহাদিগকে অবয়ব কহে।

আপত্তিবিশেষকে তর্ক কহে; যথা "যদ্যয়ং মনুষ্যঃ স্যাৎ করচরণাদিমান্ স্যাৎ" অর্থাৎ যদি ইহা মনুষ্য হইত, তবে অবশ্য ইহার হস্ত পদাদি থাকিত, ইত্যাদি আপত্তি। তর্ক পাঁচ প্রকার; আত্মাশ্রয়, অন্যোন্যাশ্রয়, চক্রক, অনবস্থা, ও প্রমাণবাধিতার্থ প্রসঙ্গ *।

পরস্পর জিগীষু না হইয়া কেবল প্রকৃত বিষয়ের তত্ত্বনির্ণয়ার্থ, বাদী প্রতিবাদীর বিচারকে বাদ কহে। ঐ বাদ বিচারে সকলে অধিকারী নহে। যাহারা প্রকৃত বিষয়ের তত্ত্বনির্ণয়েচ্ছু, যথার্থবাদী, বঞ্চকতাদি দোষ-শূন্য, যথাকালে

* অন্যোন্যাশ্রয়াদি পাঁচ প্রকার তর্কের লক্ষণ মাধবাচার্য্যকৃত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে নির্দ্দিষ্ট নাই এবং অতিশয় কঠিন বলিয়া উহা পরিত্যক্ত হইল।

প্রকৃতোপযোগী কথনে সমর্থ সিদ্ধান্ত বিষয়ের অপলাপ করে না এবং যুক্তিসিদ্ধ বিষয় স্বীকার করিয়া থাকে, তাহারাই বাদবিচারে অধিকারী। প্রকৃত বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয়াংশে দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল জিগীষাক্রমে পরমত খণ্ডন ও স্বমত ব্যবস্থাপনার্থ যে বাদী প্রতিবাদীর বাগাড়ম্বর, তাহাকে জল্প কহে। স্বমত স্থাপন হউক বা না হউক কেবল পরমত খণ্ডনার্থ যে বাগ্‌জালারম্ভ, তাহাকে বিতণ্ডা কহে। এই দুই বিচারের অধিকারী সকলেই হইতে পারেন। বিচারের রীতি এইরূপ—প্রথমতঃ বাদীকে স্বমত সংস্থাপন করিয়া স্বমতে যে যে দোষ সম্ভবে তাহার নিরাকরণ করিতে হয়, পরে প্রতিবাদীকে বাদী কর্ত্তৃক সংস্থাপিত বিষয়ে নিজ অবোধ নিরাসার্থ ঐ বিষয়ের অনুবাদ করিয়া তাহাতে দোষারোপণ পূর্ব্বক স্বমত ব্যবস্থাপন করিতে হয়, পুনর্ব্বার বাদীকে প্রতিবাদিকথিত বিষয়ে নিজ অবোধ নিরাসার্থ ঐ বিষয়ের অনুবাদ করিয়া স্বমতে প্রতিবাদিদত্ত দোষের উদ্ধার পূর্ব্বক প্রতিবাদিমতে দোষের উদ্ভাবন করিতে হয়, এবং পুনর্ব্বার প্রতিবাদীকেও এইরূপ করিতে হয়। এই রীতিক্রমে বিচার করিতে করিতে যিনি স্বমতে দোষোদ্ধারে বা পরমতে দোষ দানে অসমর্থ হয়েন তিনিই পরাজিত হয়েন। এবং এই রীতি উল্লঙ্ঘন করিয়া যিনি বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন বা অযথাকালে অর্থাৎ দোষোদ্ভাবনাদির অসময়ে দোষ দানাদিতে প্রবৃত্ত হয়েন তাঁহারও পরাজয় হয়।

প্রকৃত বিষয়ের বাস্তবিক সাধক না হইলেও আপাততঃ প্রকৃত বিষয়ের সাধক বলিয়া যাহাকে বোধ হয়, তাহাকে

হেত্বাভাস কহে, যথা "পর্ব্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ" অর্থাৎ পর্ব্বতে ধূম আছে যেহেতু বহ্নি আছে, ইত্যাদি স্থলে বহ্নিরূপ হেতু। যেহেতু বহ্নি বাস্তবিক ধূমের সাধক নহে, কারণ যে পদার্থ যাহার ব্যাপ্য না হয় সে পদার্থ তাহার সাধক হয় না এই রূপ নিয়ম আছে; বহ্নি ধূম ব্যতিরেকেও দগ্ধ লৌহ ও শুষ্ক তৃণাদিতে থাকে বলিয়া ধূমের ব্যাপ্য নহে, সুতরাং কি প্রকারে ধূমের সাধক হইবেক।* হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার; সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষিত আর বাধিত।

বক্তা যে অর্থতাৎপর্য্যে যে শব্দ প্রয়োগ করেন, সে শব্দের সে অর্থ গ্রহণ না করিয়া তদ্বিপরীত অর্থ কল্পনা পূর্ব্বক মিথ্যা যে দোষারোপ করা, তাহাকে ছল কহে; যথা "হরিপ্রসাদমহং ভক্ষয়ামি" অর্থাৎ হরির প্রসাদ আমি ভক্ষণ করিতেছি ইত্যাদি স্থলে হরি শব্দের বিষ্ণুরূপ তাৎপর্য্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া বানররূপ অর্থ কল্পনা পূর্ব্বক, কি! তুমি বানরের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ কর, যাও তুমি বড় ম্লেচ্ছ, তোমার সহিত আর আহার ব্যবহার করিব না, ইত্যাদি দোষারোপ করা। বাক্ছল সামান্য ছল ও উপচার ছল ভেদে ছল পদার্থ তিন প্রকার। অসদুত্তরকে অর্থাৎ বাদিকর্ত্তৃক সংস্থাপিত মত দূষণে অসমর্থ অথবা নিজমতের হানিজনক যে উত্তর তাহাকে জাতি কহে। জাতি পদার্থ চব্বিশ প্রকার; সাধর্ম্ম্যসম, বৈধর্ম্ম্যসম, উৎকর্ষসম, অপকর্ষসম, বর্ণ্যসম, অবর্ণ্যসম, বিকল্পসম,

* যে কারণবশতঃ পাঁচ প্রকার তর্কের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, সেই কারণবশতঃই এ স্থলে পাঁচ প্রকার হেত্বাভাসের লক্ষণ লক্ষিত হইল না, এবং পরেও জাতির এবং নিগ্রহস্থানের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ লক্ষিত হইবে না।

সাধ্যসম, প্রাপ্তিসম, অপ্রাপ্তিসম, প্রসঙ্গসম, প্রতিদৃষ্টান্তসম, অনুৎপত্তিসম, সংশয়সম, প্রকরণসম, অহেতুসম, অর্থাপত্তি-সম, অবিশেষসম, উপপত্তিসম, উপলব্ধিসম, অনুপলব্ধিসম, নিত্যসম, অনিত্যসম আর কার্য্যসম।

প্রতিজ্ঞাত বিষয়ে প্রতিবাদী দোষ দান করিলে সেই দোষের উদ্ধারে অশক্ত হইয়া প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের পরিত্যা-গাদিরূপ পরাজয়ের যে কারণ তাহাকে নিগ্রহস্থান কহে। নিগ্রহস্থান বাইশ প্রকার; প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞাবিরোধ, প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস, হেত্বন্তর, অর্থান্তর, নিরর্থক, অবিজ্ঞাতার্থ, অপার্থক, অপ্রাপ্তকাল, ন্যূন, অধিক, পুনরুক্ত, অননুভাষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিভা, বিক্ষেপ, মতানুজ্ঞা, পর্য্যনু-যোজ্যোপেক্ষণ, নিরনুযোজ্যানুযোগ, অপসিদ্ধান্ত আর হেত্বা-ভাস।

এই ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইলে অর্থাৎ এই ষোলটী পদার্থ বিশেষ রূপে জানিতে পারিলে আত্মতত্ত্বজ্ঞান জন্মে অর্থাৎ আত্মা যে শরীরাদি হইতে পৃথগ্‌ভূত তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, সুতরাং শরীরাদিতে আত্মত্ববুদ্ধি রূপ মিথ্যাজ্ঞান আর জন্মে না। এইরূপে রাগ ও দ্বেষের কারণ স্বরূপ ঐ মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে রাগ ও দ্বেষের আর উৎপত্তি হয় না, যদি রাগ ও দ্বেষই নিবৃত্ত হইল, তবে উহারদিগের কার্য্য স্বরূপ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মাত্মক প্রবৃত্তির পুনর্ব্বার উৎপত্তির সম্ভাবনা কি? আর যখন ধর্ম্ম ও অধর্ম্মই জন্মগ্রহণের মূলীভূত হইতেছে, তখন ধর্ম্মাধর্ম্ম নিবৃত্ত হইলে যে, জন্মাদিও নিবৃত্ত হইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা কি। আর যেমন কোন আশ্রয় ব্যতীত অস্মদাদির গমনাগমনাদি হয় না, সেরূপ

সুখ ও দুঃখের আয়তন স্বরূপ শরীরাদির অভাবে তত্ত্বজ্ঞানীর মরণানন্তর আর সুখ বা দুঃখ কিছুই জন্মে না, সুখ ও দুঃখ এক কালেই নিবৃত্ত হইয়া যায়; ঐ দুঃখনিবৃত্তিকেই মুক্তি কহে।

জীবাত্মাতিরিক্ত এক জন যে পরমেশ্বর আছেন তদ্বিষয়ে প্রমাণ অনুমান ও শ্রুত্যাদি। অনুমানপ্রণালী এইরূপ। যে যে বস্তু কার্য্য হয়, তাহার একজন কর্ত্তা থাকে, যেমন ঘট ও পটাদি কার্য্যের কর্ত্তা যথাক্রমে কুম্ভকার ও তন্তুবায়াদি। এইরূপ অগম্য অরণ্যস্থ বৃক্ষাদিও কার্য্য বটে, তাহারও এক জন কর্ত্তা আছে বলিতে হইবে; কিন্তু তদ্বিষয়ে অস্মদাদির কর্ত্তৃত্ব সম্ভবে না, যে হেতু তাদৃশ স্থান অস্মদাদির অগম্য, সুতরাং তৎস্থানস্থিত স্থাবরাদির কর্ত্তা যে এক জন অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন পরমেশ্বর আছেন তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি *। পরমেশ্বরের ভোগসাধন শরীর, সুখ, দুঃখ ও দ্বেষাদি কিছুই নাই, কেবল নিত্য জ্ঞান, ইচ্ছা ও যত্নাদি কএকটী গুণ আছে। জীবাত্মা নানা অর্থাৎ এক একটী শরীরের অধিষ্ঠাতা স্বরূপ এক একটী জীবাত্মা আছে। যদি সকলেরই আত্মা এক হইত তবে একজনের সুখে বা দুঃখে জগৎ সুখী বা দুঃখী হইত; যে হেতু সুখ ও দুঃখ আত্মার ধর্ম্ম, এক ব্যক্তির আত্মাতে সুখ ও দুঃখাদির সঞ্চার হইলে সকল ব্যক্তির আত্মাতে সুখ বা দুঃখের অসদ্ভাব থাকিত না। কিন্তু এই দোষ নিবারণ করিতে নয়নাদি স্বরূপ ইন্দ্রিয়কে যে আত্মা বলা

* ইহাতে অনেক আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে বটে, কিন্তু সে সকল আপত্তি অন্যান্য গ্রন্থে নিরাকৃত হইয়াছে, বিস্তারিত ভয়ে এ স্থানে প্রদর্শিত হইল না।

তাহাও ভ্রান্ত ব্যক্তির সিদ্ধান্ত বলিতে হইবে; কারণ যদি নয়নাদি স্বরূপই আত্মা হইত, তবে আমি চক্ষু ইত্যাদি ব্যবহার হইত, ও নয়নাদির বিনাশ হইলে আত্মারও বিনাশ হইত, এবং যেমন অন্য ব্যক্তির দৃষ্ট বস্তু অপর ব্যক্তি স্মরণ করিতে পারে না, সেইরূপ চক্ষু বিনষ্ট হইলে পূর্ব্ব দৃষ্ট পদার্থ সকলের স্মরণ হইত না; যেহেতু ঐ পদার্থদ্রষ্টা চক্ষুঃ বিনষ্ট হইয়াছে, সুতরাং চক্ষু কর্ত্তৃক দৃষ্ট পদার্থ আর কোন্ ব্যক্তি স্মরণ করিবে?

এবং "আমি গৌর, আমি কৃষ্ণ, আমি স্থূল বা আমি কৃশ" ইত্যাদি ব্যবহার হইতেছে বলিয়া শরীরকে আত্মা বলিয়া যে স্বীকার করা তাহাও স্থূলদর্শিতার কর্ম্ম বলিতে হইবে, কারণ যদি শরীরই আত্মা হইত তাহা হইলে কোন ব্যক্তিই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফলস্বরূপ স্বর্গ ও নরক ভোগ করিত না, যে হেতু শরীর বিনষ্ট হইলেই আত্মাও বিনষ্ট হইত সুতরাং আর কোন্ ব্যক্তি স্বর্গ বা নরকভোগ করিবে। স্বর্গ বা নরকাদিকে অলীক বলিয়াই বা কি প্রকারে স্বীকার করা যাইতে পারে, কারণ তাহা হইলে কোন ব্যক্তিই শারীরিক ক্লেশ ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া যাগাদি করিত না এবং পরদার গমনাদিরূপ নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইত না, বরং ঐহিক সুখাভিলাষে প্রবৃত্ত হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

আরও দেখ যদি শরীরই আত্মা হইত, তবে সদ্যঃ-প্রসূত বালকের হর্ষ, শোক ও ভয়াদি বা স্তনপানাদিতে প্রবৃত্তি হইত না, কারণ তৎকালে ঐ বালকের হর্ষাদির কোন কারণ নাই এবং স্তন পান করিলে যে ক্ষুধা নিবৃত্তি

হয় তাহাও জানে না, উপদিষ্ট ও হয় না; কিন্তু ইহলোক ও পরলোকগামী সুখদুঃখাদিভোক্তা, নিত্য এক অতিরিক্ত আত্ম-পদার্থ স্বীকার করিলে আর এ দোষ ঘটে না, যে হেতু ঐ বালকের পূর্ব্বানুভূত হর্ষাদির কারণের স্মৃতি হইয়াই হর্ষাদি হইয়া থাকে এবং পূর্ব্বানুভূত স্তনপানের সংস্কার বশতঃই তৎকালে স্তনপানে প্রবৃত্তি হয়, তবে আমি গৌর ইত্যাদি যে শরীরাভেদ ব্যবহার হইয়া থাকে তাহা ভ্রমাধীন বলিতে হইবে।

জৈমিনি দর্শন।

জৈমিনি দর্শন দ্বাদশাধ্যায়াত্মক, ও মহর্ষি জৈমিনির কৃত এই জন্য ইহার জৈমিনি দর্শন এই নামটী যৌগিক হইতেছে, এবং ইহাতে অনেক বেদের মীমাংসা থাকায় ইহাকে মীমাংসা-দর্শনও কহে। মীমাংসা দর্শন ধর্ম্মদর্শনের দর্পণস্বরূপ দুর্গম বেদমার্গে সুখসঞ্চলনের বাষ্পীয়রথসদৃশ। এবং শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধ ভঞ্জক মধ্যস্থ স্বরূপ। যে ব্যক্তি মীমাংসা সন্দর্শন না করিয়া শাস্ত্র-সমুদ্র হইতে ধর্ম্মের উত্তোলনে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তি, যেমত অমৃতের আশায় অসুরগণ ক্ষীরসমুদ্র হইতে বিষ উৎপাদন করিয়া জগন্মণ্ডলকে এককালে ক্ষয়-শঙ্কা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেইরূপ শাস্ত্র সমুদ্র হইতে অধর্ম্মবিষ উত্তোলন করিয়া তন্মতাবলম্বী ধার্ম্মিকাভি-মানী জনগণকে নরকনাথ হস্তে সমর্পণ করে, ইহাতে সন্দেহ

নাই। ফলতঃ মীমাংসা দর্শনের শরণাগত না হইলে বেদ ও স্মৃত্যাদির তাৎপর্য্যার্থ নিশ্চয় বা বিরোধ ভঞ্জন করা সুকঠিন; দেখ বেদে এইমাত্র লিখিত আছে, যে সোমযাগে পদধূলি যূপ কাষ্ঠে দিতে ও ঐ পদধূলির নিমিত্ত পাদ গ্রহণ করিতেও হয়, কিন্তু কাহার পদধূলি গ্রহণ করিতে হয় তাহার কিছু মাত্র নির্দ্দেশ নাই, সুতরাং সে স্থলে যে, কাহার পাদ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা নিশ্চয় করা মীমাংসাদর্শন ব্যতিরেকে কিরূপে সম্ভবে?। অতএব মীমাংসাদর্শনাবলম্বন করিয়া ঐ স্থলে এই মীমাংসা করিতে হইবে, যে, যখন ঐ সোমযাগে সোমের ক্রয়ার্থে গোর আনয়ন করিতে হয়, এই রূপ স্থানান্তরে লিখিত আছে, তখন ঐ যাগে গোই উপক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া গোরই পাদগ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহাতেই বেদের তাৎপর্য্য সন্দেহ নাই। যেরূপ ঐ স্থলে বেদের তাৎপর্য্যার্থ নিশ্চয় করা সুকঠিন, সেইরূপ শ্রুতি ও স্মৃত্যাদির পরস্পর বিরোধ ভঞ্জন পূর্ব্বক ঐ উভয়ের মান্যতা সংস্থাপন করাও সামান্য কঠিন নহে। যথা শ্রুতিতে লিখিত আছে, ইন্দ্রযাগে ঔডুম্বরীকে * স্পর্শ করিতে হয়, আর কাত্যায়ন স্মৃতিতে লিখিত আছে ঐ যাগে ঔডুম্বরীকে সর্ব্বতোভাবে বেষ্টিত অর্থাৎ আবৃত করিতে হয়। এই ক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে যদি স্মৃত্যনুসারে ঔডুম্বরীকে সর্ব্বতোভাবে আবৃত করা যায়, তাহা হইলে শ্রুতির অমান্য করা হয়,

* ঔডুম্বরী শব্দের অনেকে অনেক অর্থ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন ঔডুম্বরী শব্দে তাম্রপ্রতিমা; অধিকরণ-কৌমুদীকার কহেন, পশুবন্ধনের নিমিত্তে উডুম্বর বৃক্ষ নির্ম্মিত স্তম্ভ; এবং অধিকরণমালা ও দর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্য্যের মতে উডুম্বরবৃক্ষের শাখা।

আর যদি শ্রুতির অনুরোধে ঔডুম্বরীকে আবৃত না কর
যায় তবে স্মৃতির অবমাননা করা হয়, সুতরাং বিরুদ্ধ
ভাবাপন্ন নৃপদ্বয়ের আশ্রিত ব্যক্তির ন্যায়, উভয়পক্ষ র
করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু যেমন ঐ আশ্রিত ব্যক্তি
যদি সন্ধির উপায় অবলম্বন করিয়া সন্ধিবিধান দ্বারা
বিরোধি নৃপদ্বয়ের মান্যতা সংস্থাপন করিতে পারে, তাহ
হইলে উভয় নৃপতিরই প্রেমাস্পদ হইয়া উচ্চপদবীতে অধিরূ
হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি মীমাংসাদর্শনানুসারে ঐ স্থানে এম
মীমাংসা করে, যে শ্রুতি বা স্মৃতি কাহারই অবমাননা ন
হয় উভয়েরই মান্যতা সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলে,
ব্যক্তি প্রধান পণ্ডিতপদবীতে পদার্পণ পূর্ব্বক জগন্মণ
লীতে বিখ্যাত হইয়া উঠে সন্দেহ নাই। ঐ মীমাংসা এই—
যেমন সরস্বতী দেবীর কেশাদি কৃষ্ণবর্ণ হইলেও অধি
কাংশ শুক্লবর্ণ বলিয়া "সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী" অর্থাৎ সরস্বত
সর্ব্বতোভাবে শুভ্র ইত্যাদি, শাস্ত্রে লিখিত আছে, সেই রূ
প্রকৃত স্থলে শ্রুত্যুক্ত স্পর্শ-যোগ্য স্থানমাত্র পরিত্যাগ করি
ঔডুম্বরীর অন্য সকল অংশ বেষ্টন করিলেও স্মৃত্যুক্ত সর্ব্বতে
ভাবে বেষ্টনের কোন হানি হয় না, যেহেতু "সর্ব্বশুক্লা স্বরস্বতী
ইত্যাদি স্থলে সর্ব্ব শব্দে যেমন কেশাদি ভিন্ন সকলাং
বলিতে হয়, সেরূপ এ স্থলেও স্পর্শযোগ্য অংশ ভি
তাবৎ অংশ সর্ব্বশব্দের তাৎপর্য্য বলিতে হইবে। অ
এব যাঁহারা শ্রুতি বা স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ নিশ
করিতে সমুৎসুক হইবেন, তাঁহাদিগের যে মীমাংসাদশ
অবশ্য পাঠ্য তাহা, বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করি
পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ দর্শন এতদ্দেশে এক কা

লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে, ঐ দর্শনের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদির কথা দূরে থাকুক, পুস্তক পাওয়াও সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক পুনরায় যেরূপে ঐ দর্শনের আলোচনা হয় তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, নতুবা উত্তরকালে আর শাস্ত্র সকলের তাৎপর্য্যার্থ নিশ্চয় হইবে না। এই দর্শনে অনেক অধিকরণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক একটী বিষয়ের এক একটী সিদ্ধান্তকে অধিকরণ কহে। যথা পূর্ব্বোক্ত ঔডুম্বরীস্পর্শস্থলীয় মীমাংসাকে বিরোধাধিকরণ কহে। এক স্থলের অধিকরণ অনুসারে তৎসম অনেক স্থানের সিদ্ধান্ত করা যায়। অধিকরণকে ন্যায়ও কহে, যেমন পূর্ব্বোক্ত পাদগ্রহণস্থলীয় সিদ্ধান্তকে পদিন্যায় কহে। অধিকরণ পঞ্চাঙ্গ অর্থাৎ অধিকরণের পাঁচটী অঙ্গ আছে। যথা বিষয়, বিশয়, পূর্ব্বপক্ষ, উত্তর আর সঙ্গতি। যাহার উপলক্ষে বিচার হয় তাহাকে বিষয় কহে। এবং তদ্বিষয়ে সংশয়কে বিশয়, অসৎপক্ষাবলম্বনকে পূর্ব্বপক্ষ, বাদিমত নিরাসকে উত্তর, ও তাৎপর্য্যার্থ নিশ্চয়কে সঙ্গতি কহে *। যথা † পূর্ব্বোক্ত ঔডুম্বরী স্পর্শাদি বিধিকে বিষয় কহে, ও তদ্বিষয়ে যে, ঔডুম্বরী স্পর্শ করা কর্ত্তব্য, কি বেষ্টন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি সংশয় তাহাকে বিশয়, শ্রুতি ও স্মৃতির পরস্পর বিরোধা-

* ছলাদি দ্বারাও বাদিমত নিরাস করা যাইতে পারে, অতএব বাদিমত নিরাস রূপ উত্তরের দ্বারা বেদার্থের তাৎপর্য্যার্থ নিশ্চয় হয় না বলিয়া সঙ্গতির অপেক্ষা করে, এই সঙ্গতিকেই নির্ণয় কহে।

† যদিও সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" এই বিধি, এ স্থলের উদাহরণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে, তথাপি ঐ বিষয়টী নিতান্ত সংস্কৃত ভাষানুযায়ী, এই নিমিত্ত উহা পরিত্যাগ করিয়া স্থলান্তর প্রদর্শিত হইল।

পাদনকে পূর্ব্বপক্ষ, আপাততঃ ঐ পূর্ব্বপক্ষ নিরাসকে উত্তর আর পূর্ব্ব প্রদর্শিত মীমাংসাকে সঙ্গতি কহে। দেবগণ শরীরী বা সচেতন নহে, যে দেবের যে মন্ত্র বেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই দেব সেই মন্ত্র স্বরূপ, মন্ত্রাতিরিক্ত দেবতার সত্ত্বে কোন প্রমাণ নাই, বরং তদ্বিরোধী প্রমাণই বহুতর আছে। দেখ যদি মন্ত্র ভিন্ন এক জন শরীরী দেবতা থাকেন, সেই দেবতারই পূজা করা যায় এবং তিনিই আবহনাদি দ্বারা করুণা পূর্ব্বক ঘট ও প্রতিমাদিতে অধিষ্ঠিত হইয়া পূজাদি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে যে ঘটে কি মৃণ্ময় প্রতিমাদিতে, ইন্দ্রদেব আবাহিত হয়েন, সে ঘট কিংবা মৃণ্ময় প্রতিমাদি ঐরাবতের সহিত ইন্দ্রদেবের ভার বহনে অশক্ত হইয়া চূর্ণায়মান হইয়া যাইত সন্দেহ নাই, আর কি প্রকারেই বা অল্প পরিমিত ঘটে তাদৃশ বৃহদাকার ঐরাবতের সহিত ইন্দ্রদেবের সমাবেশ সম্ভবে, কিন্তু দেবতাকে মন্ত্রাত্মক বলিলে এ প্রকার দোষ ঘটে না।* বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ বেদ কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কৃত নহে এবং নিত্য। বেদ যদি কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কৃতই হইত, তাহা হইলে কখনই বেদোক্ত যাবদ্বিষয়ের সত্যতা থাকিত না, কোন অংশ অবশ্যই মিথ্যা হইত সন্দেহ নাই, কারণ এমন কোন ব্যক্তি অদ্যাপি

* বেদ যে অপৌরুষেয়, এ বিষয়ে অনেক অনুমান প্রণালী সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে প্রদর্শিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা এ গ্রন্থে উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক, কারণ ঐ সকল অনুমানপ্রণালী সংস্কৃত ভাষাতেই রমণীয়, বঙ্গভাষাতে তাহার কিছু মাত্র চমৎকারিতা নাই বরং প্রকৃত বিষয়ের রসভঙ্গ হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা অতএব তাহা উদ্ধৃত হইল না।

দৃষ্ট হয় না, যাহার কোন বিষয়ে কোন অংশে ভ্রান্তি না জন্মে, প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণেরও অতি স্থূল বিষয়ে ভ্রান্তি জন্মে, অতএব সকল ব্যক্তিই ভ্রান্ত, ভ্রান্ত ব্যক্তির কোন কথা কাকতালীয়-ন্যায়ে কোন অংশে সত্য হইলেও কখনই সর্ব্বাংশে সত্য হয় না, এবং ভ্রান্ত ব্যক্তির কথাতেই বা কোন্ ব্যক্তি বিশ্বাস ও সমাদর করে ? কিন্তু যখন বিশিষ্ট জনগণ বেদোক্ত বিষয়ের সর্ব্বাংশে সত্যতা ও শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া সমধিক বিশ্বাস পুরঃসর তদ্বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তখন বেদ যে নিত্য ও নির্দ্দোষ তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি।

এ স্থলে নৈয়ায়িক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কহেন, বেদোক্ত বিষয়ের সত্যতা আছে বলিয়া যে বেদের নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হইবে এমন কি নিয়ম আছে, ঘট কুম্ভকারকর্ত্তৃক কৃত এই বাক্যার্থের যাথার্থ্য আছে বলিয়া যেমন ঐ বাক্যের অভ্রান্ত পুরুষোক্ততা আছে, সেইরূপ বেদ অভ্রান্ত পুরুষ-প্রণীত এই মাত্র, নতুবা বেদ যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত নহে এমন নয়। যদি অর্থের সত্যতা থাকিলেই বাক্য নিত্য হয় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ঘট কুম্ভকারকর্ত্তৃক কৃত, এই আধুনিক বাক্যও নিত্য হইয়া উঠে। যদিও এমন অভ্রান্ত পুরুষ সচরাচর দৃষ্ট হইতেছে না বটে, কিন্তু যে তাদৃশ অভ্রান্ত পুরুষ নাই এ কথাও বলা যাইতে পারে না, যে হেতু সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বকল্যাণাকর করুণাসিন্ধু পরাৎপর পরমেশ্বর বিরাজমান রহিয়াছেন, তিনিই সর্ব্ব সাধারণের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া বেদ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার বেদ রচনার তাৎপর্য্য এই, সর্ব্ব সাধারণ জনগণ স্ব স্ব বুদ্ধি-

বৃত্তি বিত্তাদির অনুবর্ত্তী হইয়া বেদোক্ত এক একটী মার্গ অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ অভিলষণীয় পদবীতে অধিরূঢ় হউক এবং অসন্মার্গে পদার্পণ করিয়া ঘোরতর ক্লেশকর নরক-পুরীর অভিমুখে আর কেহ যাত্রা না করুক্, সকলেই ঐ মার্গ অবলম্বনে দোষ দর্শন করিয়া ঐ মার্গ এককালে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্মার্গের শরণাগত হউক।

নৈয়ায়িক মহাশয়েরা এইরূপ অনেক সূক্ষ্মানুসন্ধান করিয়া বেদের ঈশ্বরনির্ম্মিতত্ব প্রতিপাদন করেন, কিন্তু এ দিকে পরমেশ্বরের শরীরাদি কিছুই স্বীকার করেন না, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয়, যদি পরমেশ্বরের শরীরাদিই নাই তবে তিনি বেদ রচনা করিলেন কি রূপে? যে কোন বিষয় রচনা করিতে হইলে অন্ততঃ বর্ণ প্রয়োগাদিরও অপেক্ষা করে, বর্ণপ্রয়োগাদি যে, শরীরৈকদেশ কণ্ঠ ও তালু প্রভৃতির সংযোগ ব্যতিরেকে কোন ক্রমেই সম্ভবে না, ইহা ঐ নৈয়া-য়িক মহাশয়েরাই সিদ্ধ করিয়াছেন, বোধ হয়, নৈয়ায়িক মহাশয়েরা জিগীষাপরবশ হইয়া স্বমতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াও বাদিজয়ার্থে আপাততঃ বেদের ঈশ্বরনির্ম্মিতত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, নতুবা তাদৃশ সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন মহা-শয়দিগের ভ্রম হইয়াছে বলিলে সকলেই খড়্গহস্ত হইবেন। যাহা হউক নৈয়ায়িক মহাশয়দিগকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি, যেহেতু বিচারমগ্ন উক্ত মহাশয়েরা স্বমত সংস্থাপনে ও পরমত খণ্ডনে এরূপ ব্যগ্র ও সাহসী যে স্বহস্ত-নির্ম্মিত অস্ত্র দ্বারা নিজ শিরশ্ছেদন করিলেও কবন্ধের ন্যায় বাগ্‌যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হয়েন না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বাগ্‌জাল বিস্তার করেন। ফলতঃ প্রকৃত স্থলে এক মাত্র

বুদ্ধিবৃত্তির সহায়তা অবলম্বন করিয়া যে কত প্রকার কল্পনা করেন তাহা স্বয়ং বাগ্‌দেবী সরস্বতী লেখনী ধারণ করিলে পরিগণনা করিতে পারেন কি না সন্দেহ।

পাণিনি দর্শন।

এই দর্শন ভগবান্ পাণিনি মুনির প্রণীত, ইহাতে কি বেদস্থ কি লৌকিক সকল সংস্কৃত শব্দই সাধিত ও ব্যুৎপাদিত হইয়াছে, এমত সংস্কৃত শব্দ প্রায় দৃষ্ট হয় না, যাহার সহিত পাণিনি-দর্শনের সম্পর্ক নাই, ফলতঃ যেমন সংস্কৃত শব্দ হউক সকলই পাণিনি দর্শন অনুসন্ধান করিলে এক প্রকার সাধিত, ও ব্যুৎপাদিত হইতে পারে, অধুনা পাণিনি দর্শনের সদৃশ সকল পদ সাধন বিষয়ে আর দ্বিতীয় গ্রন্থ নাই। যদিও মুগ্ধবোধ প্রভৃতি অন্যান্য আধুনিক ব্যাকরণ দ্বারাও কতক গুলি পদ সাধিত হইতে পারে বটে, কিন্তু ঐ সকল ব্যাকরণ দ্বারা বেদ ব্যাখ্যা করণেচ্ছু ধার্ম্মিক জনগণের সম্পূর্ণ উপকার দর্শে না, যে হেতু আধুনিক ব্যাকরণরচনাকর্ত্তারা বৈদিক শব্দ সাধনের উপায় স্বরূপ আর স্বতন্ত্র সূত্রাদি রচনা করেন নাই, কিন্তু তাহাতে এমত বিবেচনা করিও না যে আধুনিক ব্যাকরণকর্ত্তা মহোদয়গণের বৈদিক শব্দ সম্পর্কীয় সূত্রাদি সম্পাদনের সম্পূর্ণ শক্তি ছিল না, কারণ যেমন যে ব্যক্তির বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষাদি সমাকীর্ণ পর্ব্বতোত্তোলনে সামর্থ্য থাকে, সে ব্যক্তি অনায়াসেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষাদিও উত্তোলন করিতে

পারে ; সেইরূপ যে ব্যক্তি ব্যাকরণ রচনা করিতে পারে, তাহার পক্ষে বৈদিক শব্দ সম্পর্কীয় সূত্রাদি রচনা অতি সহজ, তবে যে ঐ মহোদয়গণ ঐ বিষয়ের সূত্রাদি রচনা করেন নাই তাহার তাৎপর্য্য এই, আধুনিক ব্যাকরণ সকল কেবল বালকদিগের আপাততঃ সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তির নিমিত্ত বিরচিত হইয়াছে এতদ্ব্যতীত আর কোন উদ্দেশ্য নাই, সুতরাং যেরূপে বালকগণের ঝটিতি সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি জন্মে তদ্রূপে বিরচিত হইলেই পর্য্যাপ্ত হয়, তাহাতে আর বৈদিক শব্দ সাধনের আবশ্যক কি ; বরং তাহা রচনা করিলে অপ্রাসঙ্গিক গ্রন্থ বিস্তারাদি দোষ ঘটিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, অতএব আধুনিক ব্যাকরণকর্ত্তা মহোদয়গণের এতাদৃশ গূঢ়াভিসন্ধি অনুসন্ধান না করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি কোন অনুযোগ করা যে অকর্ত্তব্য তাহার আর সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক যখন এই দর্শনে সংস্কৃত শব্দ সকল সাধিত ও ব্যুৎপাদিত হইয়াছে তখন এই দর্শনের যে শব্দানুশাসন ও ব্যাকরণ, এই দুইটী নাম সুসঙ্গত হইতেছে, তাহা আর বলা বাহুল্য। ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রধান বেদাঙ্গ, অর্থাৎ বেদের যে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দোগ্রন্থ ও জ্যোতিষ ভেদে ছয়টী অঙ্গ আছে, তাহার মধ্যে প্রধান অঙ্গ, ব্যাকরণ, যেমন, যজ্ঞাদিরূপ কর্ম্মের প্রধান অঙ্গের নিষ্পত্তি হইলে অন্যান্য গুণীভূত অঙ্গের অননুষ্ঠান জন্য স্বর্গাদি স্বরূপ প্রকৃত ফলের কোন হানি হয় না, সেইরূপ যে ব্যক্তি ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়নে অশক্ত হইয়া বেদাঙ্গের প্রধানীভূত ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তাহারও ষড়ঙ্গবেদাধ্যয়ন জন্য প্রকৃত ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে কিছু মাত্র ক্ষতি হয় না। এ সকল ব্যক্তিরই

অবশ্য কর্ত্তব্য ও হিতকর যে ব্যাকরণ শাস্ত্র পাঠ তাহা সিদ্ধ হইল। ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি জন্মে, সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকিলে নানা উপকার দর্শে—বেদাদি শাস্ত্রের রক্ষা হয়, এবং সাধুশব্দপ্রয়োগাদি দ্বারা জনসমাজে অসীম সুখ্যাতি, অসামান্য মান্যতা, অসংখ্য সম্পত্তি ও অসদৃশ বিদ্যানন্দ ভোগ করিয়া অন্তে সংসার যাত্রা সম্বরণ পুরঃসর স্বর্গধামে অধিবাস হয়, ইহা অপেক্ষা সংসারী ব্যক্তির অভিলষণীয় আর কি আছে।

শব্দ দুই প্রকার; নিত্য আর অনিত্য। নিত্যশব্দ একমাত্র স্ফোট, তদ্ভিন্ন বর্ণাত্মক শব্দসমূহ অনিত্য। বর্ণাতিরিক্ত স্ফোটাত্মক যে একটী নিত্যশব্দ আছে, তদ্বিষয়ে অনেক গ্রন্থে অনেক যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে; তন্মধ্যে প্রধান যুক্তি এই, স্ফোট না থাকিলে কেবল বর্ণাত্মক শব্দদ্বারা অর্থবোধ হইত না। দেখ ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন অকার, গকার, নকার ও ইকার এই চারিটী বর্ণস্বরূপ যে অগ্নিশব্দ তদ্দ্বারা বহ্নির বোধ হয়। কিন্তু তাহা কেবল ঐ চারিটী বর্ণদ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না, কারণ যদি ঐ চারিটী বর্ণের প্রত্যেক বর্ণদ্বারা বহ্নির বোধ হইত, তাহা হইলে কেবল অকার কিংবা গকার উচ্চারণ করিলেও বহ্নির বোধ না হয় কেন? এই দোষ পরিহারের নিমিত্ত ঐ চারিটী বর্ণ একত্রিত হইয়া বহ্নির বোধ জন্মিয়া দেয়, এই কথা বলাও বালকতা প্রকাশ মাত্র, যেহেতু বর্ণ সকল আশুবিনাশী, পর পর বর্ণের উৎপত্তিকালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণ সকল বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং অর্থ বোধের কথা দূরে থাকুক তাহাদিগের একত্রাবস্থানই সম্ভবে না। অতএব বলিতে হইবে

ঐ চারিটী বর্ণদ্বারা প্রথমতঃ স্ফোটের অভিব্যক্তি অর্থাৎ স্ফুটতা জন্মে, পরে স্ফুট স্ফোটদ্বারা বহ্নির বোধ হয়।

এস্থলে কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত রীতিক্রমে পূর্ব্বপক্ষ করিয়া থাকেন, প্রত্যেক বর্ণদ্বারা স্ফোটের অভিব্যক্তি স্বীকার করিলে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক বর্ণদ্বারা অর্থবোধস্থলীয় দোষ ঘটে, এবং সমুদায় বর্ণদ্বারা অভিব্যক্তি স্বীকার করিলেও সেই দোষ ঘটে। অতএব উভয় পক্ষেই এ দোষ জাগরূক আছে তবে স্ফোট-স্বীকারের প্রয়োজন কি? ইহার সিদ্ধান্ত এই, যেমন একবার পাঠদ্বারাই পাঠ্যগ্রন্থের তাৎপর্য্যসমুদায় অবধারিত হয় না, কিন্তু বারংবার আলোচনা দ্বারা উহা দৃঢ়রূপে অবধারিত হয়, সেইরূপ প্রথমবর্ণ অকারদ্বারা স্ফোটের কিঞ্চিন্মাত্র স্ফুটতা জন্মিলেও সম্পূর্ণ স্ফুটতা জন্মে না, পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয়াদি বর্ণদ্বারা ক্রমশঃ স্ফুটতর ও স্ফুটতম হইয়া স্ফোট বহ্নির বোধক হয়, নতুবা কিঞ্চিন্মাত্র স্ফুট হইলেই যে স্ফোট অর্থ-বোধক হয় এমত নহে। যেমন নীল পীত ও রক্তাদি বর্ণের সান্নিধ্যবশতঃ এক স্ফটিক মণিই কখন নীল, কখন পীত, কখন বা রক্ত রূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ স্ফোট এক মাত্র হইলেও ঘট ও পটাদিরূপ বিভিন্ন বর্ণদ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া ঘট ও পটাদি রূপ ভিন্ন ভিন্ন অর্থের বোধক হয়।

এই স্ফোটকেই শাব্দিকেরা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করেন, সুতরাং শব্দ শাস্ত্র আলোচনা করিতে করিতে ক্রমশঃ অবিদ্যানিবৃত্তি হইয়া মুক্তিপদ প্রাপ্তি হয়, এজন্য ব্যাকরণ শাস্ত্রের ফল যে মুক্তি তাহাও প্রাচীন পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন যথা, ব্যাকরণ শাস্ত্র মুক্তির দ্বারস্বরূপ, বাঙ্মলাপহ, চিকিৎসা-তুল্য, এবং সকল বিদ্যার মধ্যে পবিত্র। অথবা এই ব্যাকরণ

শাস্ত্র সিদ্ধিসোপানের প্রথম পদার্পণস্থান (অর্থাৎ যাঁহার সিদ্ধ হইবার অভিলাষ আছে, তাঁহাকে প্রথমতঃ ব্যাকরণের উপাসনা করিতে হয়) এবং মোক্ষমার্গের মধ্যে সরল রাজ-বর্ত্ম স্বরূপ।

সাঙ্খ্যদর্শন।

এই দর্শন সেই মহর্ষির কৃত, যিনি শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের অবতার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন, যিনি যোগবলে এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডকে প্রত্যক্ষের অতিথি করিয়াছেন, এবং যিনি কল্পান্ত পর্য্যন্ত স্থায়ী। সেই কপিল নামক মহর্ষি দেখি-লেন যে, এই জগন্মণ্ডলে সকলেই ত্রিবিধ তাপে তাপিত অর্থাৎ আধ্যাত্মিক,* আধিভৌতিক,† আর আধিদৈবিক‡ দুঃখে দুঃখিত, এমত কোন সংসারী ব্যক্তি নাই যে ঐ তাপ-ত্রয়ে তাপিত না হয়। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, অথবা আধিদৈবিক, ইহার অন্যমত দুঃখ সকলেরই আছে। কিন্তু

* আধ্যাত্মিক দুঃখ দ্বিবিধ; শারীর আর মানস। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্ম রূপ ধাতু ত্রয়ের বৈষম্য নিমিত্ত জ্বরাদি রোগজন্য যে দুঃখ তাহাকে শারীর; আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, ঈর্ষ্যা, বিষাদ ও প্রিয় বস্তুর অদর্শনাদি জন্য যে দুঃখ তাহাকে মানস দুঃখ কহে।

† মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সর্প, বৃশ্চিক ও স্থাবরাদির দ্বারা যে দুঃখ হয় তাহাকে আধিভৌতিক দুঃখ কহে।

‡ যক্ষ রাক্ষস বিনায়ক গ্রহাদির আবেশ নিবন্ধন দুঃখকে আধি-দৈবিক দুঃখ কহে।

ঐ তাপত্রয় হইতে নিস্তারের উপায় সুচারুরূপে কিছুই নির্দ্দিষ্ট নাই। যদিও শ্রুতিতে লিখিত আছে যে তাপ ত্রয় নিবৃত্তির নানা উপায় নাই কিন্তু এক মাত্র বিবেক অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানই উহার উপায়, তথাপি ঐ বিবেক যে কি রূপে সম্পাদন করিতে হয় তাহার সবিশেষ বিধান সুচারুরূপে শ্রুতিতে লিখিত নাই; সুতরাং উহা থাকা না থাকা সমান হইয়াছে; এমত ব্যক্তির সংখ্যাও অতি অল্প যাহারা শ্রুতি মাত্র অবলম্বন করিয়া বিবেক সম্পাদন করিতে পারেন। অতএব ঐ বিবেক সম্পাদক কোন সহজ উপায় উদ্ভাবিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য এই বিবেচনা করিয়া জীবগণের প্রতি অসীম করুণা প্রকাশ পুরঃসর বিবেকোপযোগী ষড়ধ্যায়ী এই সাঙ্খ্য শাস্ত্রের আবিষ্কার করিলেন, এবং শিষ্য প্রশিষ্যাদি দ্বারা ক্রমশঃ ঐ বিবেক শাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি সাধনেও কৃতকার্য্য হইলেন। এজন্য সাঙ্খ্য গ্রন্থ যে কত আছে তাহার সংখ্যা হয় না।

এই দর্শনে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সঙ্খ্যা অর্থাৎ গণনা করিয়াছেন বলিয়াই ইহাকে সাঙ্খ্য দর্শন কহে। ঐ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব এই, মূল প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, শব্দ তন্মাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র, রূপ তন্মাত্র, রস তন্মাত্র, আর গন্ধ তন্মাত্র এই পাঁচটী তন্মাত্র, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসনা, আর ত্বক্, এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়েন্দ্রিয় স্বরূপ মনঃ, আকাশ, বায়ু অগ্নি, জল, ও পৃথিবী এই পাঁচটী মহাভূত, আর পুরুষ। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের মধ্যে কেহ কেবল-প্রকৃতি, কেহ কেহ কেবল

বিকৃতি, কেহ কেহ বা প্রকৃতি বিকৃতি উভয়ের স্বরূপ, আর কেহ অনুভয়। মূলপ্রকৃতি মহত্তত্ত্বের কারণ বলিয়া প্রকৃতিস্বরূপ, কিন্তু উহার আর প্রকৃত্যন্তর নাই বলিয়া উহা কেবল প্রকৃতি। মহদাদি পঞ্চতন্মাত্র পর্য্যন্ত সাতটী তত্ত্ব প্রকৃতি বিকৃতি উভয়াত্মক, কারণ মহত্তত্ত্ব মূল প্রকৃতির বিকৃতি আর অহঙ্কার তত্ত্বের প্রকৃতি। অহঙ্কার তত্ত্ব মহত্তত্ত্বের বিকৃতি আর পঞ্চ তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয় সকলের প্রকৃতি বলিয়া উভয়াত্মক। এবং পঞ্চ তন্মাত্র অহঙ্কারের বিকৃতি ও পঞ্চ মহাভূতের প্রকৃতি বলিয়া উহারাও উভয়াত্মক। ইন্দ্রিয়গণ ও পঞ্চ মহাভূত ইহারা কোন তত্ত্বান্তরের প্রকৃতি নহে এবং যথাক্রমে অহঙ্কারও পঞ্চতন্মাত্রের বিকৃতি এজন্য উহারা কেবল বিকৃতি। আর পুরুষ নিত্য ও অপরিণামী, ইনি কাহার প্রকৃতিও নহে বিকৃতিও নহে এজন্য অনুভয় অর্থাৎ না প্রকৃতি না বিকৃতি।

মূল প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, অর্থাৎ সমভাবে অবস্থিত যে সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণ তাহাদিগের স্বরূপ, নিত্য, নিষ্ক্রিয়, অনাশ্রিত, অর্থাৎ কোন আশ্রয় অবলম্বন না করিয়াই অবস্থিত, অসংযুক্ত, অবিভক্ত, স্বতন্ত্র, অর্থাৎ অহঙ্কারাদি তত্ত্বান্তরের সাহায্য ব্যতিরেকেই স্বকার্য্যকরণে সমর্থ, অচেতন, জড়াত্মক এবং পরিণামী। মহত্তত্ত্ব অবধি যাবতীয় পদার্থ এই দৃশ্যমান মহতী মহীমণ্ডলী প্রভৃতি মহাভূত পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থ মূল প্রকৃতির সাক্ষাৎ পরম্পরায় পরিণামবিশেষ, অর্থাৎ যেমন দধি ও তক্রাদি দুগ্ধের বিকার বিশেষ, সেইরূপ কার্য্যজাত মূল প্রকৃতির বিকার বিশেষ, মূল প্রকৃতিই কার্য্যরূপে বিকৃত হইয়াছে। যেমন দুগ্ধের বিকার

দধি, দধির বিকার নবনীত ও নবনীতের বিকার ঘৃত হইলেও দুগ্ধকে দধি ও ঘৃতাদির মূল কারণ বলা যাইতেছে, সেই রূপ যখন সকল কার্য্যই সাক্ষাৎ পরম্পরায় মূল প্রকৃতির বিকার-স্বরূপ হইতেছে তখন মূল প্রকৃতির যে "মূল প্রকৃতি" * এই নামটী যৌগিক হইতেছে ইহা কোন্ ব্যক্তি স্বীকার না করিবেন। এই প্রকৃতিতত্ত্ব স্বীকার না করিয়া ঈশ্বরের শক্তিস্বরূপ মায়াদ্বারাই জগৎকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে এই রূপ বৈদান্তিকদিগের যে মায়াবাদ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাতে কোন প্রমাণ নাই বরং তদ্বিরোধী ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা পদ্মপুরাণে পার্ব্বতীর প্রতি

ঈশ্বরের বাক্য।

† "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ। ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা। অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং প্রদর্শ্য লোকগর্হিতম্। কর্ম্মস্বরূপত্যাজ্যত্বমত্রচ প্রতিপাদ্যতে। সর্ব্ব-

* মূল=আদি, প্রকৃতি=কারণ বিশেষ, মূলপ্রকৃতি=আদি কারণ।

† এই সকল বচনের তাৎপর্য্যার্থ এই: মায়াবাদ শাস্ত্রই অসৎ শাস্ত্র এবং বাহ্য আস্তিক শাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ; (কিন্তু ইহা বাস্তবিক আস্তিকশাস্ত্র নয় নাস্তিক শাস্ত্র)। কলিকালে ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া আমিই এই শাস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছি। লোকনিন্দিত কতকগুলি শ্রুতির যথাশ্রুত যে বিরুদ্ধার্থ আছে তাহাই প্রদর্শন করাইয়া কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগের কথা লিখিয়াছি। এবং সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ প্রযুক্ত যে নৈষ্কর্ম্ম্য তাহাও লিখিয়াছি। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্য প্রদর্শন করিয়াছি। এবং ব্রহ্মের যথার্থ রূপ যে নির্গুণ তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। কলিযুগে নিখিল জগতের নাশই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। আমি জগতের সংহারের আশয়ে বেদের অযথার্থ অর্থের সহিত মায়াবাদ মহাশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছি। বাস্তবিক ইহা অবৈদিক অর্থাৎ বেদের তাৎপর্য্য নহে বেদ মূলক মাত্র।

কর্ম্মপরিভ্রংশাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং তত্র চোচ্যতে। পরাত্মজীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে। ব্রহ্মণোহস্যপরং রূপং নির্গুণং দর্শিতং ময়া। সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যত্র নাশনার্থং কলৌ যুগে। বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকং। ময়ৈব কথিতং দেবি জগতাং নাশকারণম্" ইতি।

এই সকল বচনকে অপ্রমাণ, বা কল্পিত বলিয়া কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে। কারণ যদি কল্পিতই হইত, তাহা হইলে কখনই ব্রহ্মমীমাংসার ও সাংখ্য সূত্রাদির ভাষ্যকার পণ্ডিতপ্রধান বিজ্ঞানভিক্ষু স্বীয় ভাষ্যে ঐ সকল বচন উদ্ধৃত করিতেন না। যাহা হউক "বেদা বিভিন্নাঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ নাসৌ মুনির্যস্য মতং নভিন্নম্। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" *। ইত্যাদি প্রাচীন প্রবাদানুসারে অস্মদাদির এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই; এই ক্ষণে পুনরায় প্রকৃত বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলাম।

সত্ত্বগুণ সুখস্বরূপ, লঘু ও প্রকাশক, অর্থাৎ সত্ত্বগুণ দ্বারা সকল বিষয়ের প্রকাশ হয়। সত্ত্বগুণের বৃত্তি শান্তা, অর্থাৎ সত্ত্বগুণ শান্তা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া স্বকার্য্য সম্পাদন করে। রজোগুণ দুঃখরূপ এবং উপষ্টম্ভক, অর্থাৎ সত্ত্ব ও তমোগুণ যে নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাহার প্রবর্ত্তক স্বরূপ;

* ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই: বেদ সকল পরস্পর বিভিন্ন, শ্রুতি সকলও বিভিন্ন, এবং তাঁহাকেই মুনি বলা যায় না যাঁহার মত ভিন্ন নয়। অতএব বেদ, শ্রুতি ও স্মৃত্যাদি দ্বারা ধর্ম্ম তত্ত্ব নিশ্চয় করা কঠিন, ধর্ম্মতত্ত্ব পর্ব্বতের গুহার ন্যায় নিভৃত স্থানে সংস্থাপিত আছে। অতএব মহাত্মারা যে পথ অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন তাহাই অবলম্বনীয়।

যেমন বায়ু নিজে চলিত হইয়া অন্যান্য অচল বস্তুকেও সঞ্চালিত করে, সেইরূপ সত্ত্ব ও তমোগুণ অচল হইলেও রজোগুণদ্বারা চালিত হইয়া নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করে। রজোগুণের বৃত্তি ঘোরা। তমোগুণ মোহস্বরূপ, গুরু এবং আবরক; দেখ যদি সত্ত্ব ও রজোগুণ তমোগুণ দ্বারা আবৃত বা নিযন্ত্রিত না থাকিত, তাহা হইলে উহারা সর্ব্বদাই স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিত, কখনই উহাদিগের কার্য্যের এরূপ নিয়ম হইত না। কারণ সত্ত্বগুণ রজোগুণ দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া যে কার্য্য করিবে তাহার নিবারক কে? আর রজোগুণের কথা কি বলিব সে ত স্বভাবতই চঞ্চল। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, উহারা তমোগুণের দ্বারা আবৃত ও নিয়ন্ত্রিত থাকে বলিয়াই সর্ব্বদাই কার্য্য করিতে পারে না, কিন্তু যেমন সিংহ দুর্ব্বলাবস্থায় তৃণশৃঙ্খলকেও ছিন্ন করিতে না পারিয়া অতিনিকটস্থিত জন্তুকেও নষ্ট করিতে পারে না, কিন্তু ঐ সিংহ উদ্রিক্ত হইলে লৌহশৃঙ্খলকেও তৃণ জ্ঞান করিয়া অতি দূরবর্ত্তী ব্যক্তিকেও কাল কবলে নিক্ষেপ করে, সেইরূপ সত্ত্ব ও রজোগুণ অনুদ্রিক্তাবস্থায় তমোগুণদ্বারা অবৃত থাকিলেও উদ্রিক্তাবস্থায় যে তমোগুণকে অতিক্রম করিয়া স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিবে তাহার বাধা কি? এইরূপে যখন তমোগুণ দ্বারাই কার্য্যের নিয়ম হইতেছে তখন তমোগুণকে নিয়ামক বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যায়। তমোগুণের বৃত্তি মূঢ়া, ঐ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তমোগুণ কার্য্য করে। এই গুণত্রয়ই নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন কালে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য অবলম্বন করে, কেবল এক একটী গুণদ্বারা কোন কার্য্যই হয় না। এ স্থলে কেহ কেহ আপত্তি করেন যে, ঐ গুণত্রয় যেহেতু পরস্পর বিরোধী

অতএব কার্য্যকালে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিবে কেন, বরং অনিষ্টাচরণ করিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, যেমন পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন সুন্দাসুর ও উপসুন্দাসুর। কিন্তু এ আপত্তি স্থূলদর্শীর নিকটেই রমণীয়, পণ্ডিতের নিকটে উল্লেখ্য নহে, যেহেতু পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন বস্তু সকলও পরস্পরের সহকারিতা করে, এবং ঐ সহকারিতায় এক একটী অপূর্ব্ব কার্য্যও সম্পাদিত হইয়া থাকে; যথা বর্ত্তি ও তৈলের দীপনির্ব্বাণে ক্ষমতা আছে, এবং দীপেরও ঐ উভয়কে ভস্মসাৎ করিবার শক্তি আছে, এ জন্য উহারা পরস্পর বিরুদ্ধ বটে, কিন্তু দীপ ঐ উভয়ের সাহায্যেই যাবতীয় দৃশ্য বস্তুর প্রকাশ করিতেছে; এবং যেমন বাত, পিত্ত ও কফ ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও ইহাদিগের পরস্পরের সাহায্যেই শরীর ধারণ হইতেছে, সেইরূপ ঐ গুণত্রয় পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও পুরুষার্থের সম্পাদনার্থ পরস্পর পরস্পরের সহকারিভাবাপন্ন হয়।

আর যখন ঐ গুণত্রয়ের প্রত্যেক দ্বারা কোন কার্য্য হইতেছে না, কিন্তু উহারা একত্রিত হইয়াই নিখিল কার্য্য নিষ্পন্ন করে ইহা স্থির হইল, এবং কার্য্যকারণের অভেদও অনন্তর প্রতিপাদিত হইবে, তখন কার্য্যস্বরূপ জগৎ যে ত্রিগুণাত্মক তাহা আর বলা বাহুল্য। আর যেমন নর ও মনুষ্য অভিন্ন বলিয়া নরও যাহাকে বলা যায় মনুষ্যও তাহাকে বলা যায়, সেইরূপ সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ যথাক্রমে সুখ দুঃখ ও মোহস্বরূপ বলিয়া ঐ ত্রিগুণাত্মক জগৎ-ও যে সুখ দুঃখ ও মোহ স্বরূপ তাহার আর সন্দেহ কি। যদিও যে বস্তু যাহার সুখস্বরূপ হয় সেই বস্তু কখনই তৎকালে তাহার দুঃখস্বরূপ হইতে পারে না বটে, কিন্তু কালান্তরে উহা সেই ব্যক্তির এবং তত্তৎকালেই

ব্যক্ত্যন্তরের দুঃখ ও মোহস্বরূপ হইতে পারে; যথা যে রমণী যৎকালে নিজ নায়কের সুখস্বরূপ হইতেছে, সেই রমণীই তৎকালে সপত্নীবর্গের দুঃখ স্বরূপ হইতেছে এবং উদাসীন যুবক পুরুষান্তরের মোহস্বরূপ হইতেছে। অতএব এই রীতিক্রমে বিবেচনা করিলে বোধ হইবে যে, সকল বস্তুই সুখ, দুঃখ ও মোহস্বরূপ।

মহত্তত্ত্ব বুদ্ধিস্বরূপ। বুদ্ধিতত্ত্বদ্বারাই যাবদ্বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা নিশ্চয় হয়, ঐ নিশ্চয়কে অধ্যবসায় কহে; অধ্যবসায় বুদ্ধির ধর্ম্ম। এবং যেমন নীল পীতাদি বর্ণ ঘট পটাদির ধর্ম্ম হইলেও "নীলোঘটঃ পীতোঘটঃ" ইত্যাদি স্থলে ঐ ঐ বর্ণের সহিত ঘট পটাদির অভেদ প্রতীতি ও ব্যবহার হইতেছে, সেইরূপ ধর্ম্ম ধর্ম্মীর অভেদবশতঃ কোন স্থলে বুদ্ধিধর্ম্ম অধ্যবসায়ের সহিতও বুদ্ধির অভেদ বোধ ও ব্যবহার হয়; এজন্য অধ্যবসায় শব্দেও বুদ্ধির নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বুদ্ধির আরও আটটী ধর্ম্ম আছে, যথা ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য। তন্মধ্যে আদিম চারিটী সত্ত্বগুণসম্ভূত বলিয়া সাত্ত্বিক, আর অন্তিম চারিটী তামস অর্থাৎ তমোগুণজাত; কিন্তু ঐ উভয় কার্য্যেরই রজোগুণের সাহায্য আছে। ধর্ম্ম দুই প্রকার; অভ্যুদয়হেতু ও নিঃশ্রেয়সহেতু। যজ্ঞদানাদিজন্য এবং ঐহিক পারলৌকিক সুখসম্পাদক যে ধর্ম্ম তাহাকে অভ্যুদয়হেতু, আর অষ্টাঙ্গ যোগাদির অনুষ্ঠান জন্য মুক্তিসাধক ধর্ম্মকে নিঃশ্রেয়সহেতু ধর্ম্ম কহে। প্রকৃতির সহিত পুরুষের ভেদজ্ঞানকে বিবেক ও তত্ত্বজ্ঞান কহে। রাগের অর্থাৎ বিষয়ানুরাগের অভাবকে বৈরাগ্য কহে।*

* কেহ কেহ রাগের বিরোধী ভাব পদার্থকে বৈরাগ্য কহে।

অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, বশিত্ব, ঈশিত্ব, ও কামাবসায়িত্ব ভেদে ঐশ্বর্য্য অষ্টবিধ। অণিমা অণুতা, অর্থাৎ অতি সূক্ষ্মতা; এই ঐশ্বর্য্য দ্বারা শিলামধ্যেও প্রবেশ শক্তি জন্মে। লঘিমা লঘুতা, অর্থাৎ গুরত্বগুণশূন্যতা, এই ঐশ্বর্য্য থাকিলে এমন লঘু হয় যে, সূর্য্যকিরণকে অবলম্বন করিয়া সূর্য্যলোক পর্য্যন্তও গমন করিতে পারে। মহিমা মহত্ত্ব, অর্থাৎ অতিস্থূলতা; এই ঐশ্বর্য্য দ্বারা অতি ক্ষীণ ব্যক্তিও প্রকাণ্ড আকার ধারণে সমর্থ হয়। প্রাপ্তি ঐশ্বর্য্য থাকিলে চন্দ্রকেও অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা স্পর্শ করা যায়। প্রাকাম্য ইচ্ছার অনভিঘাত, অর্থাৎ ইচ্ছার অপ্রতিরোধ। যাহার এই ঐশ্বর্য্য আছে, সে যদি ইচ্ছা করে যে "যেমন অন্যান্য জনগণ জলে উন্মজ্জন ও নিমজ্জন করে আমি সেইরূপ ভূমিতেই করিব" তবে তাহাও করিতে পারে। বশিত্ব ঐশ্বর্য্য দ্বারা ভূত বা ভৌতিক পদার্থ সকলেই বশীভূত হয়। ঈশিত্ব ঐশ্বর্য্য দ্বারা ভূত ভৌতিক পদার্থ সকলের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করিতে পারা যায়। সত্যসঙ্কল্পতার নাম কামাবসায়িত্ব; এই ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি যখন যাহা সংকল্প অর্থাৎ নিশ্চয় করেন, তখন তাহাই সিদ্ধ হয়। তাঁহার নিশ্চয় কখনই ব্যর্থ হয় না; যদি বলেন যে, "এই আম্রবৃক্ষে নারিকেল ফল ফলিবে, এই অমাবস্যার দিবসে চন্দ্র উদিত হইবেন, এবং এই মৃত ব্যক্তি পুনরায় প্রত্যাগত হইবে" তবে তাহাই ঘটিয়া উঠে।

ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এই চারিটী ধর্ম্মের বিপরীত যথাক্রমে অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য। এই চারিটী বুদ্ধির ধর্ম্ম। অভিমানকে অহঙ্কার কহে। ঐ অহঙ্কার দ্বারাই

“আমি করিতেছি, আমার গৃহ, আমা হইতে ধনী বা বিদ্বান্ পৃথিবীতে কেহ নাই, আমাকে সকলেই মান্য করে” ইত্যাদি অভিমান হইয়া থাকে, এজন্য অভিমান অহঙ্কারের ধর্ম্ম, ইহাতেই অভিমান ও অহঙ্কারের অভিন্নরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে, যেমন নীল বর্ণের সহিত ঘটাদির। শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র অতি সূক্ষ্ম বলিয়া সূক্ষ্ম ও অবিশেষ পদবাচ্য, এবং দেবতা ও যোগীদিগেরই প্রত্যক্ষের বিষয়, অস্মদাদির ইন্দ্রিয়গোচর নহে। নয়নাদি ত্বক্ পর্য্যন্ত পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শের প্রত্যক্ষ হয়; এবং বাগাদি উপস্থ পর্য্যন্ত পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা অনুক্রমে বাক্য প্রয়োগ, বস্তুর গ্রহণ, গমন, উৎসর্গ অর্থাৎ পুরীষত্যাগ ও আনন্দ অর্থাৎ রমণসুখ নিষ্পন্ন হয়। এই উভয়বিধ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যেই মনের সহকারিতা আছে, এজন্য মনকে উভয়েন্দ্রিয় কহে। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মনঃ ইহারা শরীরের অন্তরে থাকে, এজন্য ইহাদিগকে অন্তঃকরণ কহে। আর নয়নাদি উপস্থ পর্য্যন্ত দশটী ইন্দ্রিয় শরীরের বহিঃস্থিত বলিয়া বাহ্যেন্দ্রিয় এবং বাহ্যকরণ পদবাচ্য। অন্তঃকরণ তিন ও বাহ্যকরণ দশ; এই রূপে করণ সমুদায়ে ত্রয়োদশটী, একারণ কিংবদন্তী আছে যে, করণ ত্রয়োদশ প্রকার।

পঞ্চভূত স্থূল, অস্মদাদিরও প্রত্যক্ষের বিষয়, এবং বিশেষ পদ বাচ্য। ঐ পঞ্চভূত ত্রিবিধ; শান্ত, ঘোর ও মূঢ়। যাহারা সত্ত্বপ্রধান তাহারা শান্ত, সুখস্বরূপ, প্রসন্ন এবং লঘু। যাহারা রজোগুণপ্রধান, তাহারা ঘোর, ও দুঃখাত্মক, চঞ্চল। আর যাহারা তমোগুণপ্রধান, তাহারা মূঢ়, মোহস্বরূপ, গুরু

এবং বিষণ্ন। বুদ্ধি অবধি মহাভূত পর্য্যন্ত সকল তত্ত্বই অনিত্য, অব্যাপক, সক্রিয়, অনেক, আশ্রিত, সংযোগী, বিভক্ত, পরতন্ত্র, এবং ব্যক্তপদবাচ্য।

পুরুষ নিত্য, সত্ত্বাদিত্রিগুণশূন্য, চেতন স্বরূপ, সাক্ষী, কুটস্থ, দ্রষ্টা, বিবেকী, সুখদুঃখাদিশূন্য, মধ্যস্থ, ও উদাসীনপদবাচ্য। ইনি অকর্ত্তা অর্থাৎ কোন কার্য্যই করেন না, সকলই প্রকৃতির কার্য্য; তবে যে "আমি করিতেছি, আমি সুখী বা দুঃখী" ইত্যাদি প্রতীতি হইতেছে সে ভ্রমমাত্র। বস্তুতঃ সুখ, দুঃখ বা কর্ত্তৃত্ব আত্মার নাই, সুখ দুঃখাদি বুদ্ধির ধর্ম্ম; দেখ, কখন পরমসুখজনক সামগ্রী সমবধানেও সুখ হয় না, কখন বা অতি সামান্য বিষয়েও পরম সুখ লাভ হয়; আর কাহার রাজ্য লাভে এবং পল্যঙ্ক শয়নেও সুখ বোধ হয় না, কেহ বা ভিক্ষা লাভে ও ছিন্ন মন্দোরীতে শয়ন করিয়াও পরম আনন্দ ভোগ করে। অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে, সুখকর বা দুঃখকর কিছুই অনুগত নাই, যখন যে বস্তুকে সুখকর বা দুঃখকর বলিয়া বোধ হয়, তখনই তাহা দ্বারা যথাক্রমে সুখ বা দুঃখ হইয়া উঠে; অতএব সুখ দুঃখাদি বুদ্ধির ধর্ম্ম।

পুরুষ শরীর ভেদে নানা, অর্থাৎ এক একটী শরীরের অধিষ্ঠাতা আত্মা স্বরূপ এক একটী পুরুষ আছেন। যদি সকল শরীরের অধিষ্ঠাতা পুরুষ এক হইত, তাহা হইলে একের জনন বা মরণে সকলেরই জনন বা মরণ হইত, এবং একের সুখ বা দুঃখে জগন্মণ্ডল সুখী বা দুঃখী হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন সুখ দুঃখের এরূপ নিয়ম রহিয়াছে তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক পুরুষ নানা, এবং যে পুরুষ যেরূপ

কার্য্য করে তাহাকে তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। যদিও আত্মার সুখ বা দুঃখাদি কিছুই নাই ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হওয়াতে “এক জনের সুখে জগৎ সুখী না হয় কেন?” এ রূপ আপত্তি উত্থাপিতই হইতে পারে না, তথাপি যেমন “জবাপুষ্প সন্নিধানে অতি শুভ্র স্ফটিকও রক্তের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ আত্মার স্বীয় বুদ্ধিস্থ সুখ দুঃখাদিকে আত্মগত বিবেচনা করিয়া “আমি সুখী আমি দুঃখী” এইরূপ বোধ হয়, সকল ব্যক্তির ঐকাত্ম্যপক্ষে এক জনের ঐরূপ বোধ হইলে সকলের না হয় কেন” এরূপ আপত্তির খণ্ডন হয় না। এবং “আমি ভোজন করিতেছি” ইত্যাদি যে ব্যবহার হইতেছে তাহা শরীরের ক্রিয়া লইয়াই সমর্থন করিতে হইবে, যেহেতু আত্মার ক্রিয়া বা কর্ত্তৃত্ব কিছুই নাই।

ঐ শরীর দ্বিবিধ; স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল শরীর মাতা পিতার দ্বারা সম্পন্ন হয়; মাতা হইতে লোম, রক্ত ও মাংস হয়, পিতা হইতে স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা * জন্মে। এই ছয়টী বস্তু ঘটিত বলিয়া স্থূল শরীরকে ষাট্‌কৌষিক, এবং উক্ত রীতি-ক্রমে মাতা পিতা দ্বারা সম্পাদিত হওয়াতে মাতাপিতৃজ শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। এই শরীরেরই উৎপত্তি ও বিনাশ হয়; এই শরীরই অন্তে, হয় মৃত্তিকা, না হয় ভস্ম অথবা শৃগাল কুক্কুরাদির পুরীষরূপে পরিণত হইবেক, যিনি যত যত্ন করুন না কেন, কেহই এই শরীরকে অজরামর করিতে পারি-

---

* মেদঃ।

বেন না; সকলই কিছু দিনের নিমিত্ত, অন্তে আর দ্বিতীয় পথ নাই; পৃথিবীশ্বরেরও যে গতি, দরিদ্রেরও সেই গতি।

সূক্ষ্ম শরীর, বুদ্ধি, অহঙ্কার, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, মনঃ, ও পঞ্চতন্মাত্র, এই অষ্টাদশ তত্ত্বের সমষ্টি। ইহা নিত্য, অর্থাৎ মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী, এবং অব্যাহত, অর্থাৎ অপ্রতিহতগতি। সূক্ষ্ম শরীর শিলামধ্যেও প্রবেশ করিতে পারে এবং ইহলোক পরলোক গামী, অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীর কখন নর, পশু, পক্ষী, শিলা ও বৃক্ষাদি-স্বরূপ স্থূল শরীর ধারণ করে, এবং কখন স্বর্গীয়, কখন বা নারকীয় স্থূল শরীর আর কখন পুনর্ব্বার মনুষ্যাদি শরীর গ্রহণ করে। এই শরীরেরই সুখ দুঃখ ভোগ হয়, এই শরীরের বিনাশ হয় না। প্রকৃতি সর্গের আদিতে এক একটী পুরুষের এক একটী সূক্ষ্ম শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সূক্ষ্ম শরীর অধুনা আর জন্মে না। সকল পুরুষই জীবাত্মা, জীবাত্মাতিরিক্ত পরম পুরুষ পরমেশ্বরে কোন প্রমাণ নাই, ইহা স্বয়ং কপিল দেবই "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই সূত্র দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন, আর এবিষয়ে ষড়্দর্শনটীকাকার পণ্ডিতপ্রধান বাচস্পতিমিশ্রও তত্ত্বকৌমুদীগ্রন্থে অনেক যুক্তি দিয়াছেন এবং ঈশ্বর-সাধক যুক্তি সকল খণ্ডন করিয়াছেন; এ বিষয়ের প্রতিপোষণার্থ দর্শনসংগ্রহকারও সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে নানা যুক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, ঐ সমস্ত পরে লিখিত হইতেছে। কিন্তু সাঙ্খ্যপ্রবচন ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু কহেন যে, কপিলদেবের মতেও ঈশ্বর আছেন, তবে যে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই সূত্র রচনা করিয়াছেন সে কেবল বাদীকে জয় করিবার আশয়ে প্রৌঢ়িবাদ মাত্র। অতএব "ঈশ্বরাভাবাৎ" এরূপ সূত্র রচনা না

করিয়া "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই সূত্র রচনা করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই, কপিলদেব বাদীকে কহিতেছেন, তুমি যুক্তি দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধি করিতে পারিলে না এইমাত্র: ফলতঃ ঈশ্বর আছেন; ঈশ্বর নাই ইহা কপিলদেবের অভিপ্রেত নহে।

"যেমন ঘট পটাদি জড়াত্মক বস্তু কোন চেতন পদার্থের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে স্বকার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ও শক্ত হয় না, কিন্তু যখন সচেতন বস্তু অধিষ্ঠাতা হইয়া উহাদিগের আনয়নাদি করে, তখনই ঐ ঘট পটাদি স্বকার্য্য জলাহরণাদিতে প্রবৃত্ত ও শক্ত হয়, সেইরূপ প্রকৃতিও জড়াত্মক, সুতরাং কি রূপে তিনি কোন সচেতন অধিষ্ঠাতা ব্যতিরেকে কার্য্যকরণে প্রবৃত্ত বা শক্ত হইবেন? অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রকৃতিরও এক জন সচেতন ব্যক্তি অধিষ্ঠাতা আছেন; কিন্তু জীবাত্মাকে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা বলিতে পারা যায় না, যেহেতু জীবগণ স্থূলদর্শী ও অসর্ব্বজ্ঞত্বাদি দোষে দূষিত; জীবের এমন কি শক্তি আছে যে জগৎ করণে প্রবৃত্ত প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হইতে পারে, সুতরাং তাদৃশ শক্তিসম্পন্ন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বারাধ্য পরমেশ্বরের সত্তা স্বীকার করিতে হইবেক। তিনিই প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা" এই যুক্তি দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ করা, যেমন "কাকে তোমার কর্ণ লইয়া গেল" এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র নিজ কর্ণে হস্তার্পণ না করিয়াই কাকের প্রতি ধাবন করা উপহসনীয়, তত্তুল্য; কারণ চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে জড় বস্তু যে কার্য্য করিতে পারে না ইহাই আদৌ অসিদ্ধ, যে হেতু চেতনাধিষ্ঠান ব্যতিরেকেও অনেক জড় বস্তুর কার্য্যকরণে প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে, যথা অভিনবজাত কুমারের বৃদ্ধি ও জীবন-

ধারণার্থ জড়াত্মক দুগ্ধ * প্রবৃত্ত হইতেছে এবং জনগণের উপকারার্থ সময়ে সময়ে অতি জড় যে মেঘ সেও বর্ষণে প্রবৃত্ত হইতেছে। অতএব জীবের কৈবল্যার্থে জড়াত্মক প্রকৃতিও জগন্নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইবে, তন্নিমিত্ত ঈশ্বর স্বীকারের প্রয়োজন কি।?

আর ঈশ্বর সংস্থাপনের আশয়ে "ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া প্রকৃতিকে জগন্নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত করেন, বা স্বয়ংই প্রবৃত্ত হয়েন" এই কথা বলা, যেমন তপনজনিত সন্তাপ শান্তির আশয়ে প্রজ্বলিত জ্বলনের সেবন করা সন্তাপ নিবর্ত্তক না হইয়া সমধিক সন্তাপের নিমিত্তই হইয়া উঠে, সেই রূপ (বিবেচনা করিয়া দেখিলে) ঈশ্বরসাধক না হইয়া ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বাদির ব্যাঘাতকই হইয়া উঠে। দেখ, করুণাশব্দে পরের দুঃখ নিবারণেচ্ছা বুঝায়। সুতরাং "ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া সৃষ্টি করেন" ইহার অর্থ এই হইল, পরমেশ্বর জীবের দুঃখ নিবারণেচ্ছায় সৃষ্টি করেন; কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে কাহারও দুঃখ ছিল না। দুঃখও পরমেশ্বর সৃষ্ট করিয়াছেন, ইহা প্রতিবাদীরাও স্বীকার করিয়া থাকেন; তবে ঈশ্বর প্রথমতঃ কাহার নিবারণাশয়ে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, আর কি হেতুই বা সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের এইরূপ অসৎ দুঃখের নিবারণে ইচ্ছা হইল? যদি রোগ থাকে, তবেই তন্নিবারণার্থে ঔষধ সেবন করিতে হয়, নতুবা কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সুস্থ থাকিয়াও ঔষধ সেবনে ইচ্ছা করে? বরং তাহার প্রতি সর্ব্বতোভাবে দ্বেষই প্রকাশ করিয়া থাকে। আর যেমন

* এস্থলে কেহ বলেন দুগ্ধ বহির্নির্গমে প্রবৃত্ত হয়, আর কেহ কহেন উহা নিজ জন্মে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ বালকের নিমিত্তই জন্মে।

সুস্থ ব্যক্তির ঔষধ সেবনে রোগ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বলিয়া যদি কোন সুস্থ ব্যক্তি ঔষধ সেবন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে সকলেই তাহাকে অজ্ঞ ও অবিবেচক বলিয়া থাকে, সেইরূপ যদি ঈশ্বর জীবগণের দুঃখ না থাকাতেও তন্নিবারণে সমুৎসুক হইয়া সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে কোন্ ব্যক্তি না স্বীকার করিবেন যে, ঈশ্বর অজ্ঞ ও অবিবেচকের ন্যায় সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা ও বিবেচকতাদি ঈশ্বরত্ব শক্তিই বা আর কোথায় রহিল; ঈশ্বর অস্মদাদি অপেক্ষাও অজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। কিঞ্চ, এই দোষ পরিহারের নিমিত্ত জীবে দুঃখ সঞ্চারের পর পরমেশ্বর করুণা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এই কথা বলাও অজ্ঞান জলধির তরঙ্গস্বরূপ বলিতে হইবে, যে হেতু তাহা হইলে "জীবগণের দুঃখের আবির্ভাব হইলে ঈশ্বর তন্নিবারণের আশয়ে সৃষ্টি করেন এ জন্য সৃষ্টি দুঃখকে অপেক্ষা করিতেছে, এবং সৃষ্টি হইলে দুঃখের আবির্ভাব হয় এজন্য দুঃখও সৃষ্টিসাপেক্ষ" এই পরস্পর সাপেক্ষতারূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে। আরও দেখ, যদি পরমেশ্বর করুণা করিয়াই সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে কখন কেহ সুখী বা দুঃখী হইত না, যেহেতু সকলেই পরমেশ্বরের কৃপার পাত্র এবং পরমেশ্বর পক্ষপাতাদি দোষ শূন্য। অতএব সিদ্ধ হইল যে, পরমেশ্বর নাই কেবল অচেতন প্রকৃতিই জগন্নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

আর যেমন নির্ব্ব্যাপার অয়স্কান্ত মণির সন্নিধানে জড়াত্মক লৌহেরও ক্রিয়া হইতেছে, সেইরূপ জীবাত্মক পুরুষ সন্নিধানে জড় স্বরূপ প্রকৃতিরও জগন্নির্ম্মাণার্থ ক্রিয়া হওয়া

অসম্ভাবিত নহে। এবং যেরূপ স্বামিকর্ত্তৃক দৃষ্টদোষা স্ত্রী আর স্বামির নিকটে যায় না তাহার নিকট হইতে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানিপুরুষ কর্ত্তৃক দৃষ্টদোষা প্রকৃতি তাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়েন, আর তাঁহার সংসার সৃষ্ট করেন না। অথবা যেমন নর্ত্তকী নৃত্যদর্শনরূপ স্বকার্য্য সম্পাদন করিয়া নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ প্রকৃতিও পুরুষকে সংসাররূপ রঙ্গ দর্শা-ইয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়েন। আর যথা কেবল পঙ্গু বা কেবল অন্ধ ব্যক্তি স্বাভিলষিত স্থানে গমন করিতে পারে না কিন্তু যদি অন্ধ ব্যক্তি পঙ্গুকে স্বকীয় স্কন্ধে আরোহণ-পুরঃসর তৎপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করে, তবে উভয়েই স্বাভিলষিত সম্পাদনে সমর্থ হয় এজন্য ঐ উভয় পরস্পর সাপেক্ষ; সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে (অর্থাৎ পুরুষ-কর্ত্তৃক অভেদে দৃষ্ট হইয়াই) তাহার সংসার সৃষ্ট করেন এজন্য প্রকৃতি পুরুষসাপেক্ষ, আর পুরুষও প্রকৃতিগত সুখ দুঃখকে আত্মগত বিবেচনা করিয়া তন্নিবারণাভিলাষে মুক্তি প্রার্থনা করেন। ঐ মুক্তি প্রকৃতির সহিত পুরুষের অন্যতাখ্যাতি (অর্থাৎ ভেদজ্ঞান স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান) ব্যতিরেকে জন্মে না, সেই তত্ত্বজ্ঞান প্রকৃতি দ্বারাই সম্পাদিত হয়, প্রকৃতি ব্যতীত সম্ভবে না এ জন্য পুরুষও প্রকৃতি সাপেক্ষ। অত-এব সিদ্ধ হইল যে, প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পরসাপেক্ষ।

প্রমাণ ত্রিবিধ; প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। এই মতে সকল কার্য্যই সৎ, অর্থাৎ সকল কার্য্যই উৎপত্তির পূর্ব্বে স্ব স্ব কারণে সূক্ষ্ম রূপে সংসক্ত থাকে, পরে যখন আবির্ভূত হয় তখন তাহাকে উৎপন্ন কহে, আর যখন তিরোভূত হয় অর্থাৎ পুন-রায় নিজ কারণে বিলীন হয় তখন তাহাকে বিনষ্ট কহে।

বস্তুতঃ কোন কার্য্য উৎপন্ন বা বিনষ্ট হয় না। দেখ তিলের, ধান্যের ও স্ত্রীস্তনের অন্তরে যথাক্রমে তৈল, তণ্ডুল ও দুগ্ধ সর্ব্বদাই আছে; কিন্তু যখন অনুক্রমে তাহাদিগের পীড়ন, অবঘাত ও দোহন করা যায়, তখনই তৈল্য, তণ্ডুল ও দুগ্ধ উৎপন্ন হইল, এরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, নতুবা পূর্ব্বে কেহ ঐরূপ ব্যবহার করে না। কিঞ্চ, যেমন কূর্ম্মের অঙ্গ যখন বহির্নিঃসৃত হয় তখনই আবির্ভূত হইল, আর যখন অন্তর্নিবিষ্ট হয় তখনই তিরোভূত হইল, এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, সেইরূপ যখন কারণ হইতে কার্য্য বহির্নিঃসৃত হয় তখনই আবির্ভূত ও উৎপন্ন হইল, এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে; আর যখন কারণে প্রবেশ করে তখন তিরোভূত ও বিনষ্ট হইল, এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। এতন্মতাবলম্বীরা নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক মতসিদ্ধ অসৎ বস্তুর উৎপত্তি ও সৎ বস্তুর বিনাশ স্বীকার করেন না। কারণ যদি কার্য্য সকল পূর্ব্বে অসৎ থাকে, তবে তাহাকে পরে সৎ করা কাহার সাধ্য! এক বস্তুর পূর্ব্বে যেরূপ স্বভাব থাকে পরেও সেইরূপ স্বভাব থাকে কখনই স্বভাবের বৈলক্ষণ্য হয় না; দেখ, অদ্যাপি এমন ব্যক্তি দৃষ্ট বা শ্রুতিগোচর হয়েন না যিনি নীল বস্তুকে পীত বা মনুষ্যকে গো, স্ত্রীকে পুরুষ, বন্ধ্যার পুত্রোৎপাদন করিতে পারেন। আরও দেখ, যখন কারণ হইতে কার্য্য অভিন্ন হইতেছে, তখন কারণকে সৎ, আর কার্য্যকে অসৎ বলা কিরূপে সম্ভবে। এ স্থলে আপাততঃ এরূপ আপত্তি হইতে পারে, "যদি কার্য্য কারণের ভেদ না থাকে তবে তন্তুর কার্য্য পটদ্বারা যেরূপ আবরণাদি হইতেছে, তন্তু দ্বারা সেরূপ না হয়

কেন ?” কিন্তু এ আপত্তি কোন ক্রমেই বিচারসহ হইতে পারে না। দেখ, যেমন এক জন বাহক দ্বারা শিবিকা বহন হয় না এবং এক মুষ্টি তৃণ দ্বারা অবিরত বিগলিত বারিধারা নিবারিত হয় না, কিন্তু যথাক্রমে বাহক ও তৃণমুষ্টি সমূহ যথানিয়মে একত্রিত হইলে অনায়াসেই ঐ ঐ কার্য্য সম্পাদিত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক তন্তু দ্বারা আবরণাদি কার্য্য না হইলেও তাদৃশ বিলক্ষণ সংস্থান দ্বারা পটভাবাপন্ন তন্তু সমূহ দ্বারা আবরণাদি কার্য্য হইবার বাধা কি ? এবং পট রূপে অপরিণত তন্তু দ্বারাই বা আবরণাদি হইবার সম্ভাবনা কি ? অতএব কার্য্যকারণের অভেদ স্বীকার করিলে কোন হানি নাই, বরঞ্চ ভেদ স্বীকার করিলে অনেক দোষ ঘটে। দেখ, যে বস্তু যে বস্তু হইতে ভিন্ন হয়, সে বস্তুর সহিত সে বস্তুর, হয় সংযোগ, না হয় অপ্রাপ্তি থাকে; যেমন পর্ব্বতের সহিত বহ্নির ও বস্ত্রের সহিত শরীরাদির সংযোগ আছে, এবং হিমগিরির সহিত বিন্ধ্যগিরির অপ্রাপ্তি রহিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই প্রতিবাদী মহাশয়েরা পটের সহিত তন্তুর সংযোগ বা অপ্রাপ্তি কিছুই স্বীকার করিবেন না, অথচ পটের সহিত তন্তুর ভেদ স্বীকার করিবেন। যাহা হউক কার্য্য কারণের ভেদ পক্ষে এক প্রবল দোষ আছে; দেখ, বিভিন্ন বস্তুর গুরুত্বাদি গুণ বিভিন্ন এবং ঐ ঐ গুণের কার্য্যও বিভিন্ন, আর বিভিন্ন বস্তু দ্বয় একত্রিত হইলে ঐ উভয়ের দ্বিগুণ গুরুত্ব নিবন্ধন গুরুত্বের কার্য্যও দ্বিগুণ হয়। যথা একপলিক স্বস্তিকের গুরুত্ব নিবন্ধন তুলাদণ্ডের যাদৃশ অবনতি হয় দ্বিপলিক স্বস্তিকের বা এক পলিক স্বস্তিকদ্বয়ের গুরুত্বদ্বারা ততোধিক অবনতি হয় ইহা বালকেরও অবিদিত

নহে। সুতরাং কার্য্য কারণের বিভিন্নরূপতা স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, কার্য্যের গুরুত্ব হইতে কারণের গুরুত্ব ভিন্ন, এবং ঐ ঐ গুরুত্ব দ্বয়ের কার্য্যও ভিন্ন, আর কার্য্য কারণ একত্র হইলে ঐ উভয়ের দ্বিগুণ গুরুত্বের কার্য্যও দ্বিগুণ হয়। কিন্তু ইহাতে প্রতিবাদী মহাশয়দিগের কোন উপকার নাই, স্বর্ণকারাদিরই অধিক লাভের সম্ভাবনা; কারণ একপলিক স্বস্তিকের সহিত তোলিত করিয়া যে স্বর্ণ স্বর্ণকার-হস্তে সমর্পণ করা যায়, সেই স্বর্ণই অলঙ্কার হইলে দ্বিপলিক স্বস্তিকের সমতুল হইবার সম্ভাবনা, যেহেতু ঐ এক-পলিক স্বর্ণের গুরুত্ব, আর তৎকার্য্য অলঙ্কারের গুরুত্ব উভয়ে মিলিয়া দ্বিপলিক স্বস্তিকের গুরুত্ব সদৃশ হইতেছে, সুতরাং স্বর্ণকারদিগের এক মুদ্রায় এক মুদ্রা লাভের সম্ভাবনা, ইহাতেই বোধ হয়, স্বর্ণকারের প্রতি করুণা করিয়া অথবা তদ্দত্ত তৈলবট গ্রহণের আশয়ে নৈয়ায়িক মহাশয়েরা কার্য্য কারণের ভেদ ব্যবস্থার আবিষ্কার করেন, নতুবা তাদৃশ সূক্ষ্মবুদ্ধি মহাশয়দিগের ভ্রম হইয়াছে এ কথা কে বলিবে। ফলতঃ কার্য্য যে অসৎ নয় ইহা ভগবদ্‌গীতাতেই লিখিত আছে, যথা *"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" ইতি।

এই রূপে যখন স্থির হইল যে, কার্য্য সৎ এবং ঐ কার্য্য উৎ-পত্তির পূর্ব্বে সৎ স্বরূপ নিজ কারণে সূক্ষ্ম রূপে থাকে, তখন "অসৎ কারণ হইতে সৎস্বরূপ কার্য্য হয়" এই সৌগতদিগের সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক ও অগ্রাহ্য তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি। আরও দেখ, অসৎ বস্তু কখনই কারণ

* অসৎ বস্তুর কখনই উৎপত্তি হয় না। আর সদ্বস্তুর কখন অভাব হয় না।

হইতে পারে না, অদ্যাপি কোন স্থলে কোন ব্যক্তি কখন দেখেন নাই, বা শ্রবণ করেন নাই যে, বন্ধ্যার পুত্র কোন কার্য্য করিতেছে, এবং শশশৃঙ্গ দ্বারা কোন অনিষ্ট হইল। কিন্তু এ জন্য বৈদান্তিকেরা যে কহেন "যেমত রজ্জুতে সর্পের ভ্রম হয় সেইরূপ সচ্চিদানন্দ পরাৎপর ব্রহ্মে এই জগতের ভ্রম হই-তেছে, বাস্তবিক জগৎ সৎ নহে" ইহাও অনুচিত ও অশ্রো-তব্য; কারণ রজ্জুতে সর্পের জ্ঞানকে যে ভ্রম বলাযায় তাহার কারণ বাধদর্শন, সেই রূপ সৎকার্য্য বিষয়ে কোন বাধক দেখিতেছি না, তবে ভ্রম বলিয়া ভ্রান্ত হইব কেন? আরও দেখ, সদৃশ বস্তুতেই সদৃশ বস্তুর ভ্রম হইয়া থাকে, নতুবা বিস-দৃশ বস্তুতে বিসদৃশ বস্তুর ভ্রম কাহারও কখন হয় না, রৌপ্যে কখনই স্বর্ণের ভ্রম হয় না। সুতরাং জড়াত্মক জগতের ভ্রম কি রূপে অতি স্বচ্ছ সচ্চিদানন্দে সম্ভবে? অতএব প্রত্যক্ষের অপলাপ করিয়া জগতের মিথ্যাত্ব স্বীকার করা কেবল নাস্তিকতা প্রকাশ মাত্র সন্দেহ নাই।

সৃষ্টির প্রক্রিয়া এইরূপ, প্রথমতঃ প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার হয়, সত্ত্বগুণোদ্রিক্ত ঐ অহঙ্কার হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের উৎপত্তি হয়, রজোগুণোদ্রিক্ত অহঙ্কার হইতে পঞ্চ-তন্মাত্র জন্মে, এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত জন্মে। তাহারও প্রণালী এইরূপ, শব্দ তন্মাত্র হইতে আকাশ হয়, আকাশের গুণ শব্দ। শব্দ তন্মাত্র ও স্পর্শ তন্মাত্র এই উভয় হইতে বায়ু জন্মে, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ। ঐ দুই তন্মাত্রের সহিত রূপ-তন্মাত্র হইতে তেজঃ জন্মে, তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। ঐ তিন তন্মাত্রের সহিত রস তন্মাত্র হইতে

জল হয়, জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, আর রস। ঐ চারিটী তন্মাত্র সহকারে গন্ধ তন্মাত্র হইতে পৃথিবী হয়, পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এই পঞ্চ মহাভূত হইতেই চতুর্দ্দশ ভুবন ও তদন্তর্বর্ত্তী কার্য্যজাত হয়।

পাতঞ্জল দর্শন।

এই দর্শন ভগবান্ পতঞ্জলি মুনির প্রণীত বলিয়া পাতঞ্জল শব্দে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আর ইহাতে যোগের বিষয় বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকায় ইহাকে যোগশাস্ত্রশব্দে, এবং পদার্থ নির্ণয়াংশে সাঙ্খ্যদর্শনের সহিত ঐকমত্য থাকায়, অর্থাৎ মতভেদ না থাকায় সাঙ্খ্য-প্রবচন শব্দেও নির্দ্দেশ করা যায়। সাঙ্খ্যমতপ্রদর্শক কপিল মুনি, যে রূপ প্রকৃতি ও মহৎ তত্ত্ব প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, সেই রূপ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, মহর্ষি পতঞ্জলিরও অভিমত, কিন্তু কপিল মতে জীবাতিরিক্ত, সর্ব্ব-নিয়ন্তা, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্, লোকাতীত পরমেশ্বরের সত্তা স্বীকৃত হয় নাই*। ভগবান্ পতঞ্জলি মুনি যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক ঈশ্বর

* কপিলকৃত সাঙ্খ্যসূত্রের সাঙ্খ্যপ্রবচনভাষ্যে বিজ্ঞানাচার্য্য লিখিয়াছেন, সাঙ্খ্যমতেও ঈশ্বরসত্তা স্বীকৃত আছে; কিন্তু ষড়্দর্শন-টীকাকার বাচস্পতিমিশ্র তত্ত্বকৌমুদীতে লিখিয়াছেন যে, সাঙ্খ্যমতে ঈশ্বর নাই। এবং মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে কপিলকৃত সাঙ্খ্যদর্শনকে নিরীশ্বর সাঙ্খ্যদর্শনশব্দে নির্দ্দেশ করিয়া জানাইয়াছেন যে কপিলমতে ঈশ্বর নাই। বস্তুতঃ "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই কপিলসূত্র সন্দর্শন করিলে স্পষ্ট

সত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এ কারণেই কপিলদর্শন ও পাতঞ্জল দর্শনকে যথাক্রমে নিরীশ্বর ও সেশ্বর সাঙ্খ্য দর্শন কহে। পাতঞ্জল দর্শন পাদচতুষ্টয়ে বিভক্ত। প্রথম পাদে যোগশাস্ত্র করিবার প্রতিজ্ঞা, যোগের লক্ষণ, যোগের অসাধারণ উপায়স্বরূপ যে অভ্যাস ও বৈরাগ্য তাহাদিগের স্বরূপ ও ভেদ, সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত ভেদে সমাধি-বিভাগ, সবিস্তার যোগোপায়, ঈশ্বরের স্বরূপ, প্রমাণ, উপাসনা ও তৎফল, চিত্তবিক্ষেপ, দুঃখাদি, চিত্তবিক্ষেপের ও দুঃখাদির নিরাকরণোপায়, এবং সমাধি প্রভেদ প্রভৃতি বিষয় সকল প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয়ে ক্রিয়াযোগ, ক্লেশ সকলের নির্দ্দেশ, স্বরূপ, কারণ ও ফল, কর্ম্মের প্রভেদ, কারণ স্বরূপ ও ফল, বিপাকের কারণ ও স্বরূপ, তত্ত্ব-জ্ঞান রূপ বিবেকখ্যাতির অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ভেদে কারণ যে যম নিয়মাদি তাহাদিগের স্বরূপ ও ফল, এবং আস-নাদির লক্ষণ, কারণ ও ফল প্রদর্শিত হইয়াছে। তৃতীয়ে যোগের অন্তরঙ্গ স্বরূপ যে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি তাহাদিগের স্বরূপ, পরিণাম ও প্রভেদ, এবং বিভূতিপদবাচ্য সিদ্ধি সকল প্রদর্শিত হইয়াছে। চতুর্থপাদে সিদ্ধিপঞ্চক, বিজ্ঞানবাদ-নিরাকরণ, সাকারবাদসংস্থাপন, এবং কৈবল্য প্রদর্শিত হই-য়াছে। ঐ চারিটী পাদ যথাক্রমে যোগপাদ, সাধনপাদ বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ শব্দে বুঝিতে হইবেক।

পতঞ্জলি মতে ষড়্‌বিংশতি তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এই ষড়্‌বিংশতি তত্ত্বেই যাবতীয় পদার্থ অন্তর্ভূত হইবেক, এত-

প্রতীয়মান হয় সাঙ্খ্যমতে ঈশ্বর নাই। অতএব আমরা এস্থলে কপিলমতে ঈশ্বর নাই লিখিলাম।

দতিরিক্ত পদার্থান্তর নাই। প্রকৃতিতত্ত্ব প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব সাঙ্খ্যদর্শনসংগ্রহে সবিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে, এস্থলে পুনরুক্তিভয়ে পরিত্যক্ত হইল। ষড়্‌বিংশ তত্ত্ব পরমেশ্বর।

পরমেশ্বর স্বীকারের যুক্তি এই ; সাতিশয় অর্থাৎ তারতম্য-রূপে অবস্থিত বস্তুসকলের শেষ সীমা আছে, যথা অল্পত্ব ও অধিকত্ব পরিমাণের শেষ সীমা যথাক্রমে পরমাণু ও আকাশ। অতএব যখন কাহাকে ব্যাকরণমাত্রে, কাহাকে কাব্য ও অলঙ্কারে, আর কাহাকে বা ঐ ঐ শাস্ত্র এবং দর্শন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, জ্ঞানাদিও সাতিশয় পদার্থ, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক জ্ঞানাদিও কুত্রাপি শেষ সীমা প্রাপ্ত হইয়া নিরতিশয়তা পদে পদার্পণ করিয়াছে। যে পদার্থ যাদৃশ গুণের সদ্ভাব ও অভাবে যথাক্রমে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্টরূপে পরিগণিত হয়, সেই পদার্থের সর্ব্বতোভাবে তাদৃশ গুণবত্তারূপ অত্যুৎকৃষ্টতাকে নিরতিশয়তা কহে। অণুর পরম অণুতা, স্থূলের পরম স্থূলতা, মূর্খের অত্যন্ত মূর্খতা, বিদ্বানের সকল বিদ্যাবত্তাই অত্যুৎকৃষ্টতা বলিতে হইবে, নতুবা তদ্বিপরীত স্থূলতাদি অণু প্রভৃতির উৎকৃষ্টতা হইবে না। জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা ও অপ-কৃষ্টতা বিবেচনা করিতে হইলে অধিকবিষয়কতা ও অল্পবিষয়-কতাই লক্ষিত হইবেক ; এ কারণই কিঞ্চিন্মাত্র শাস্ত্রজ্ঞানীকে অপকৃষ্ট জ্ঞানী, আর অধিকশাস্ত্রজ্ঞানীকে উৎকৃষ্টজ্ঞানী কহে। এই রূপে যখন অধিকবিষয়কতাই জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা ইহা সিদ্ধ হইল, তখন এই অপরিচ্ছিন্ন-ব্রহ্মাণ্ডস্থ খেচর, অরণ্যচর ও অস্মদাদির চক্ষুর অগোচর সর্ব্ববস্তুবিষয়কতাই যে জ্ঞানের অত্যুৎকৃষ্টতারূপ নিত্য নিরতিশয়তা তাহা আর বলিবার

অপেক্ষা কি? ঐ নিত্য নিরতিশয়জ্ঞান স্বরূপ সর্ব্বজ্ঞতা জীবের সম্ভবে না; যেহেতু জীবের বুদ্ধিবৃত্তি রজোগুণ ও তমোগুণ দ্বারা কলুষিত থাকায় দৃক্‌শক্তি পরিচ্ছিন্ন; পরিচ্ছিন্ন দৃক্‌শক্তি দ্বারা কখনই সর্ব্বগোচর জ্ঞান সম্ভবে না, সুতরাং অপরিচ্ছিন্ন-দৃক্‌শক্তিমান্‌কেই তাদৃশ সর্ব্বজ্ঞতার এক মাত্র আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক সন্দেহ নাই। ঐ অপরিচ্ছিন্ন দৃক্‌-শক্তিমান্ যিনি তিনিই অস্মদাদির অভিমত পরমেশ্বর, তদ্ভিন্ন অন্যকে আমরাও পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করি নাই। এই রূপে যখন পরমেশ্বরসত্তা সিদ্ধ হইল, তখন পরমেশ্বর নাই বলিয়া বাগাড়ম্বর করা কেবল অজ্ঞানবিজৃম্ভিতমাত্র সন্দেহ নাই। পরমেশ্বর বক্ষ্যমাণ ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাকা-শয়াদি রহিত, জগন্নির্ম্মাণার্থ স্বেচ্ছানুসারে শরীর ধারণ পূর্ব্বক সংসারপ্রবর্ত্তক, সংসারানলে সন্তপ্যমান ব্যক্তি সকলের অনু-গ্রাহক, অসীমকৃপানিধান, এবং অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বত্র দেদী-প্যমান রহিয়াছেন। আর পরমেশ্বর যোগপরতন্ত্র অর্থাৎ যথানিয়মে যোগানুষ্ঠান করিলে অভীষ্টফলপ্রদ ও সাক্ষাৎ-প্রত্যক্ষ হয়েন।

চিত্তবৃত্তির নিরোধকে, অর্থাৎ বিষয় সুখে প্রবৃত্ত চিত্তকে বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত ও ধ্যেয়বস্তুমাত্রে সংস্থাপিত করিয়া তন্মাত্রের ধ্যান বিশেষকে যোগ কহে। অন্তঃকরণকে চিত্ত কহে। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র আর নিরুদ্ধ ভেদে চিত্তের অবস্থা পঞ্চবিধ। রজোগুণের উদ্রেক হওয়ায় যে অবস্থাতে চিত্ত অস্থির হইয়া সুখ দুঃখাদি জনক বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, সেই অবস্থাকে ক্ষিপ্তাবস্থা কহে। দৈত্যদানবাদির চিত্ত প্রায় ঐ অবস্থাতে থাকে। যে অবস্থায় তমোগুণের

উদ্রিক্ততানিবন্ধন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিচারমূঢ় হইয়া ক্রোধাদি-বশতঃ চিত্ত সর্ব্বদা বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে মূঢ়াবস্থা কহে। ঐ মূঢ়াবস্থান্বিত চিত্ত রক্ষঃপিশাচাদির স্বভাবসিদ্ধ। সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইলে চিত্ত দুঃখকর বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া সর্ব্বদা সুখসাধনে প্রবৃত্ত হয়। ঐ কালে চিত্তের বিক্ষিপ্তা-বস্থা জন্মে; দেবতাদিগের চিত্ত প্রায় বিক্ষিপ্তাবস্থা পরিত্যাগ করে না। এই তিন অবস্থাই যোগের প্রতিকূল, অর্থাৎ এই তিন অবস্থাতে কখনই যোগসাধন হয় না। সত্ত্বগুণে বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট হইলে চিত্তের একাগ্রতা ও নিরুদ্ধ অবস্থা জন্মে। এই দুই অবস্থাই যোগের অনুকূল; এ অবস্থাদ্বয় না হইলে কখনই যোগ সিদ্ধ হয় না।

চিত্তের অবস্থা বিশেষকে চিত্তবৃত্তি কহে। চিত্তবৃত্তি পাঁচ প্রকার; প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, আর স্মৃতি। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম, অর্থাৎ শব্দ ভেদে প্রমাণ ত্রিবিধ। মিথ্যাজ্ঞান অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞানকে বিপর্য্যয় কহে, যেমন রজ্জুকে সর্প ও শুক্তিকে রৌপ্য বলিয়া জানা। কোন বিষয় বাস্তবিক অত্যন্ত অসম্ভাবিত বলিয়া স্থির থাকিলেও তদর্থপ্রতিপাদক শব্দ শ্রবণমাত্র আপাততঃ তদ্বি-ষয়ের যে জ্ঞান জন্মে তাহাকে বিকল্প কহে। মধ্যাহ্নে চন্দ্রোদয় হওয়া অলীক বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস থাকিলেও যদি কেহ কহে যে, মধ্যাহ্নে চন্দ্রোদয় হইয়াছে দর্শন কর, তবে সকলেরই তৎ-ক্ষণাৎ ঐ শব্দের প্রয়োগবশতঃ ঐ অসম্ভাবিত অর্থের বোধ হইবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, অন্যথা ঐ শব্দ-শ্রবণমাত্র ঐ অসঙ্গত অর্থ বুদ্ধিবৃত্তিতে অধিরূঢ় না হইলে ঐ শব্দ-প্রযোক্তা ব্যক্তি বুদ্ধিমৎসমাজে মিথ্যাবাদী বলিয়া ঘৃণিত

হইত না। পশু পক্ষি প্রভৃতি জন্তুদিগের শব্দ শ্রবণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি ঐ ঐ জন্তুদিগকে অসংলগ্নবাদী বলিয়া থাকে? তাহার কারণ কেবল ঐ ঐ জন্তুদিগের শব্দ শ্রবণ করিয়া অর্থ বোধের অভাব। এই রূপে যখন সিদ্ধ হইতেছে, অর্থ সঙ্গতই হউক বা অসঙ্গতই হউক, শব্দশ্রবণমাত্রেই তদর্থের বোধস্বরূপ শাব্দবোধ হয়, তখন নৈয়ায়িক ও আলঙ্কারিক প্রভৃতি মহোদয়গণের "অসঙ্গত অর্থ বোধক শব্দের অর্থ বোধ স্বরূপ শাব্দবোধ হয় না" এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্তে পতিত হইতেছে সন্দেহ নাই। আরও দেখ, শব্দশ্রবণাধীন অসঙ্গতার্থের বোধ স্বীকার না করিলে ঐ ঐ মহোদয়দিগের অধুনা সম্মান সংবর্দ্ধনের অদ্বিতীয় উপায় স্বরূপ বিচারই হইতে পারে না; কারণ যদি প্রতিবাদী সঙ্গতার্থ শব্দ প্রয়োগ করে, তবে তাহার প্রতি দোষোদ্ভাবন করা হয় না; আর যদি অসঙ্গতার্থ শব্দ প্রয়োগ করে, তাহা হইলে ঐ ঐ মতে তাহার অর্থবোধই হয় না, সুতরাং বিচার কালে উক্ত মহাশয়দিগকে উভয়থাই মৌনাবলম্বন করিতে হয়; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উক্ত মহাশয়েরাই বিচারকালে প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন পূর্ব্বক অধিক বাগাড়ম্বর করেন। এই এই স্থলে শাব্দবোধের পদে বোধান্তরকে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করা, ঔদ্ধত্যমদে মত্ত হইয়া অকৃতাপরাধী চিরপ্রতিপালক প্রভুর সম্পদে অপরিচিত ব্যক্তির অভিষেক করাইতে বাঞ্ছা করার ন্যায়, নিতান্ত গর্হিত, বিশেষতঃ পণ্ডিতগণের কদাচ কর্ত্তব্য নয়। আরও বিবেচনা কর, ঐ ঐ মহোদয়দিগের যদি নিতান্ত শাব্দবোধের প্রতি বিদ্বেষ এবং বোধান্তরের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে

সর্ব্বত্রই শাব্দবোধ পরিত্যাগ করিয়া বোধান্তরের শরণ লওয়া উচিত, নতুবা পতি ও উপপতি উভয়েরই প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী রমণীর বৃত্তি অবলম্বন করা কি পণ্ডিতের পক্ষে প্রশংসাকর হইতেছে? অতএব নব্য ন্যায়গ্রন্থকারক কোন কোন সূক্ষ্মদর্শী মহাশয়েরা গড্ডলিকাপ্রবাহে পতিত না হইয়া অসংগতার্থেরও শাব্দবোধ স্বীকার করিয়াছেন। নিদ্রা শব্দে প্রসিদ্ধ নিদ্রাকে বুঝিতে হইবেক। ফলতঃ যৎকালে তমোগুণের অত্যন্ত উদ্রেক হয় তৎকালে নিদ্রা জন্মে। এবং স্মরণকে স্মৃতি কহে। এই পাঁচ প্রকার চিত্তবৃত্তিই চিত্তের পরিণামবিশেষ বলিয়া চিত্তের ধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম নহে; যেহেতু আত্মা অপরিণামী, কূটস্থ ও নিত্য। আত্মা ও পরমেশ্বরভিন্ন সকল বস্তুই পরিণামী, কোন বস্তুই পরিণামবিনির্মুখে ক্ষণ কালও থাকে না, সকল বস্তুরই সর্ব্বদা পরিণাম হইতেছে।

পরিণাম ত্রিবিধ; ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা। মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদির যথাক্রমে ঘট সরাবাদি ও কটক কুণ্ডলাদিকে ধর্ম্ম পরিণাম, ঐ ঐ ধর্ম্মের বর্ত্তমানত্ব ও ভূতত্বাদিকে লক্ষণ পরিণাম, আর ধর্ম্মিস্বরূপ মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদির নূতনত্ব ও পুরাতনত্বাদিকে অবস্থাপরিণাম কহে। যোগস্বরূপ চিত্তবৃত্তিনিরোধ অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা সমুৎপন্ন হয়। বহুকাল নিরন্তর আদরাতিশয় সহকারে কোন বিষয়ে যত্ন করাকে অভ্যাস, আর বিষয়সুখবিতৃষ্ণাকে বৈরাগ্য কহে। যাহার বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, সে বিবেচনা করে, সুখদুঃখজনক বিষয়ের বশীভূত আমি নই, আমারই বশবর্ত্তী সুখদুঃখাদিজনক বিষয়; এ কারণ বৈরাগ্যকে বশীকারশব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। বিষয় দ্বিবিধ, দৃষ্ট ও আনুশ্রবিক।

ইহলোকে উপভুজ্যমান বিষয়কে দৃষ্ট, আর পরলোকে ভোক্তব্য বিষয়কে আনুশ্রবিক কহে। ইহার উদাহরণ যথাক্রমে বনিতা, স্রক্ ও চন্দনাদি, এবং স্বর্গ নরকাদি। ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তি দর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব, আর অনবস্থিতত্ব এই কয়েকটী যোগের প্রতিবন্ধক, অর্থাৎ ইহারা, রজোগুণ ও তমোগুণের প্রাদুর্ভাব উৎপন্ন হইয়া চিত্ত বিক্ষেপ সম্পাদন দ্বারা একাগ্রতার প্রতিরোধ করে। ধাতু বৈষম্য নিমিত্ত জ্বরাদিকে ব্যাধি, অকর্ম্মণ্যতাকে স্ত্যান, "যোগ করা যায় কি না" ইত্যাদি সন্দেহকে সংশয়, অনবধানতাকে প্রমাদ, যোগসাধনে ঔদাসীন্যকে আলস্য, যোগে প্রবৃত্ত্যভাবের হেতুভূত চিত্তের গুরুত্বকে অবিরতি, যোগাঙ্গ ভ্রান্তিকে ভ্রান্তিদর্শন; সমাধি-ভূমির অপ্রাপ্তিকে অলব্ধভূমিকত্ব, এবং সমাধিতে চিত্তের অস্থৈর্য্যকে অনবস্থিতত্ব কহে। এই কয়েক কারণ বশতঃ চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে দুঃখ, দৌর্মনস্য, অঙ্গমেজয়ত্ব, শ্বাস ও প্রশ্বাসাদি জন্মে। চিত্তের রজোংশের পরিণামবিশেষকে দুঃখ কহে। দুঃখ প্রতিকূল-বেদনীয়, কেহই দুঃখকে অনুকূল বিবেচনা করেন না। বাহ্য বা আন্তরিক কোন কারণ বশতঃ চিত্তের ঔদাসীন্যকে দৌর্মনস্য, সর্ব্বাঙ্গ কম্পকে অঙ্গমেজয়ত্ব, প্রাণ বায়ুর বহির্দ্দেশ হইতে অন্তঃপ্রবেশকে শ্বাস, আর অন্তর হইতে বহির্দ্দেশ গমনকে প্রশ্বাস কহে। দুঃখাদি কয়েকটী দোষ চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে পুনরায় চিত্তের একাগ্রতার প্রতিবন্ধক হয়। কিন্তু বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তি, চিত্তপ্রসাদ জন্মিলে পুনরায় যোগ করণে সমর্থ হয়। চিত্তপ্রসাদজনক উপায় অনেক আছে; তন্মধ্যে কয়েকটী প্রদর্শিত হইতেছে। চিত্তশুদ্ধিসমুৎসুক ব্যক্তি-সক-

লের কর্ত্তব্য, সাধু ব্যক্তির সুখ সন্দর্শন করিয়া ঈর্ষ্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ ব্যক্তির সহিত মিত্রতা করেন, এবং দুঃখী ব্যক্তির দুঃখ পরিহারের চেষ্টা করেন। দুঃখী ব্যক্তির প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করা অতি অকর্ত্তব্য। পুণ্যবানের পুণ্য প্রশংসা করিয়া হৃষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য, তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ করা অনুচিত। পাপী ব্যক্তির প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিবে, তদ্বিষয়ে অনুমোদন বা বিদ্বেষ কিছুই করিবে না। এই কয়েকটী কর্ম্মকে পরিকর্ম্ম কহে।

যোগ দ্বিবিধ; জ্ঞানযোগ আর ক্রিয়াযোগ। পূর্ব্বোক্ত যোগকে জ্ঞানযোগ কহে। জ্ঞানযোগের অধিকারী সকলে নহে; যাহাদিগের চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছে, তাহাদিগেরই জ্ঞানযোগে অধিকার আছে। যাহাদিগের চিত্তপ্রসাদ না হইয়াছে তাহাদিগকে প্রথমতঃ ক্রিয়াযোগ করিতে হয়। ক্রিয়াযোগ তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান ভেদে তিন প্রকার। বিধিপ্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করিয়া কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদির অনুষ্ঠান দ্বারা শরীরশোধনকে তপস্যা কহে। প্রণব ও গায়ত্রী প্রভৃতি মন্ত্রের অধ্যয়নকে স্বাধ্যায় কহে। ঐ মন্ত্র দ্বিবিধ; বৈদিক ও তান্ত্রিক। বৈদিক মন্ত্রও দ্বিবিধ; প্রগীত আর অপ্রগীত। সামবেদীয় মন্ত্রকে প্রগীত কহে, যেহেতু সামমন্ত্রের গান করিতে হয়। অপ্রগীতও দ্বিবিধ; ঋক্ ও যজুর্ম্মন্ত্র। তন্ত্রোক্ত মন্ত্রকে তান্ত্রিক মন্ত্র কহে। তান্ত্রিক মন্ত্র স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক ভেদে ত্রিবিধ। যে মন্ত্রের অন্তে "নমঃ" এই শব্দ আছে, তাহাকে নপুংসক মন্ত্র, আর যাহার অন্তে "বহ্নিজায়া" অর্থাৎ স্বাহা এই শব্দ আছে, তাহাকে স্ত্রী মন্ত্র কহে; এতদতিরিক্ত সকল মন্ত্রই পুরুষমন্ত্র। পুরুষ মন্ত্রই সিদ্ধ মন্ত্র;

অর্থাৎ অন্যান্য মন্ত্র সকলের সংস্কার না করিলে কার্য্য সিদ্ধ হয় না, কিন্তু পুরুষমন্ত্রের সংস্কার হউক বা না হউক, ঐ মন্ত্র যদর্থে অনুষ্ঠিত হইবে সেই কার্য্য তৎক্ষণাৎ সুসিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ পুরুষ মন্ত্র বশীকরণাদি কর্ম্মে অতি প্রশস্ত।

মন্ত্রের সংস্কার দশ প্রকার, জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গুপ্তি। মাতৃকাবর্ণ, অর্থাৎ স্বর ও হলবর্ণ, হইতে বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রের উদ্ধারকে জনন, মন্ত্রের অন্তর্গত বর্ণ সকলকে প্রণবযুক্ত করিয়া জপ করাকে জীবন, মন্ত্রঘটক বর্ণ সকলকে লিখিয়া চন্দনযুক্ত জল দ্বারা বায়ু বীজ * উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রত্যেক বর্ণের তাড়নাকে তাড়ন, ঐ রূপ মন্ত্রবর্ণকে লিখিয়া করবীর পুষ্প দ্বারা প্রতি বর্ণের প্রহারকে বোধন, স্বকীয় তন্ত্রানুসারে অশ্বত্থপত্রের দ্বারা মন্ত্রের অভিষেককে অভিষেক, মন্ত্রকে চিন্তা করিয়া জ্যোতির্ম্মন্ত্র দ্বারা মন্ত্রের মলত্রয়ের দাহ করাকে বিমলীকরণ, মন্ত্রপূত কুশোদক দ্বারা বারিবীজ † উচ্চারণ করিয়া বিধিবৎ মন্ত্রের প্রোক্ষণকে আপ্যায়ন, মন্ত্রে মন্ত্রপূত বারি দ্বারা তর্পণকে তর্পণ, তার, ‡ মায়া, ¶ রক্ষা, § বীজাদির যোগ করাকে দীপন, এবং জপ্য মন্ত্রের অপ্রকাশনকে গোপন কহে। এই দশ বিধ সংস্কার করিলে মন্ত্রের রুদ্ধ, কীলিত, বিচ্ছিন্ন, সুপ্ত ও শপ্তাদি দোষ থাকে

* অর্থাৎ য়ং।

† "বং" এই বীজকে বারিবীজ কহে।

‡ ওঁ।

¶ শ্রীং।

§ অর্থাৎ হ্রীং।

না, এ কারণ মন্ত্রজপের পূর্ব্বে এই দশবিধ সংস্কার করা অতি আবশ্যক এবং প্রকৃতফলোপযোগী। জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত শুভাশুভ কর্ম্ম সকলের ফলাভিসন্ধি ব্যতিরেকে ঈশ্বরে সমর্পণ করাকে ঈশ্বর প্রণিধান কহে। এই ঈশ্বর প্রণিধানকেই ক্রিয়াফল সন্ন্যাস কহে। ফলাভিসন্ধি ব্যতিরেকে যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাতেই ঈশ্বর সন্তুষ্ট হয়েন; ফলাভিসন্ধান করিয়া কর্ম্ম করিলে কখনই ঈশ্বর সন্তুষ্ট হয়েন না ইহা পণ্ডিতপ্রধান নীলকণ্ঠ ভারতী স্পষ্ট লিখিয়াছেন, যথা "যে কর্ম্ম ফলাভিসন্ধিতে আরব্ধ করা যায়, সে কর্ম্ম অতি প্রযত্ন সহকারে সম্পন্ন করিলেও তাহাতে ঈশ্বরের তুষ্টি জন্মে না, সে কর্ম্ম কুক্কুর কর্ত্তৃক অবলীঢ় পায়সাদির সদৃশ।"

উল্লিখিত ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করিলে ক্লেশ সকলের তনুতা অর্থাৎ ক্ষীণতা জন্মে। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ ভেদে ক্লেশ পঞ্চবিধ। অবিদ্যা শব্দে অজ্ঞান স্বরূপ মোহকে বুঝায়। অতথাভূত বস্তুকে তথাভূত করিয়া জানাকে অজ্ঞান কহে। এই অবিদ্যাই অন্যান্য ক্লেশের মূলীভূত, সুতরাং অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলেই অন্যান্য ক্লেশও নিবৃত্ত হয়, এবং অবিদ্যা প্রবৃত্ত হইলেই সকল ক্লেশ প্রবৃত্ত হয়। আত্মার সহিত অন্তঃকরণের অভেদজ্ঞানকে অস্মিতা কহে। এই অস্মিতা বশতই নির্লেপ আত্মাকে ও "অহং কর্ত্তা" ইত্যাদি কর্ত্তৃত্বাদ্যভিমানে লিপ্ত করে। সুখকর বিষয়ে অভিলাষকে রাগ কহে; এই রাগবশতঃ সকলে সংসারে প্রবৃত্ত হয়। দুঃখজনক বিষয়ে যে বিদ্বেষ ভাব তাহাকে দ্বেষ কহে; এই দ্বেষরূপ দোষ থাকাতেই আপাততঃ ক্লেশকর যোগাদিতে সর্ব্ব সাধারণ জনগণ প্রবৃত্ত

হয় না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে অনুভূত যে অসহ্য মরণদুঃখ তদ্বাসনা বশতঃ; অর্থাৎ তাহার স্মরণ বশতঃ ইহ জন্মে যে মরণভয় উপস্থিত হয়, তাহাকে অভিনিবেশ কহে। এই অপরিচ্ছিন্ন ধরামণ্ডলে সচেতন পদার্থ মাত্রেরই অন্তঃকরণে অভিনিবেশ সর্ব্বদা জাগরূক রহিয়াছে।

এই পঞ্চবিধ ক্লেশ কর্ম্ম, বিপাক ও কর্ম্মাশয়ের মূলীভূত। বৈধ ও অবৈধ ভেদে কর্ম্ম দ্বিবিধ। বৈধকর্ম্ম বেদ বোধিত যজ্ঞাদি, আর অবৈধ কর্ম্ম বেদ নিষিদ্ধ ব্রহ্মহত্যাদি। কর্ম্মফলকে বিপাক কহে। বিপাক জাতি, আয়ুঃ ও ভোগভেদে তিন প্রকার। জাতি দেবত্ব মনুষ্যত্বাদি। আয়ুঃ চিরজীবিত্ব অল্পজীবিত্বাদি। ভোগসাধন ও ভোগ্য ভেদে ভোগও দ্বিবিধ। ভোগসাধন ইন্দ্রিয়াদি, ভোগ্য সুখ-দুঃখ-জনক বিষয়জাত। সংসার রূপে অবস্থিত যে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম তাহাকেই কর্ম্মাশয় কহে। কর্ম্মাশয় পুণ্য ও পাপভেদে দ্বিবিধ। সংস্কার রূপে অবস্থিত কর্ম্মকে পুণ্য, আর বেদবিরুদ্ধ কর্ম্মকে পাপ কহে। ঐ উভয় কর্ম্মাশয়ও দ্বিবিধ; দৃষ্টজন্মবেদনীয় ও অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। ইহ জন্মে যে পুণ্য বা পাপ স্বরূপ কর্ম্মাশয়ের ভোগ হয় তাহাকে দৃষ্টজন্মবেদনীয়, এবং জন্মান্তরে যাহার ভোগ হয় তাহাকে অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কহে। যদি অতিশয় যত্ন ও বিশেষ নিয়ম সহকারে নিরন্তর বহুকাল দেবতার আরাধনাদি করা যায়, অথবা ব্রহ্মবধাদি নিন্দনীয় কর্ম্ম করা যায়, তাহা হইলে ইহ জন্মেই ঐ ঐ কর্ম্মের ফল ভোগ হয় সন্দেহ নাই; যেমন মহাদেবের আরাধনা করাতে নন্দীশ্বরের বিশিষ্ট জন্মাদি এবং তপোবলে বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণজাতি প্রাপ্তিরূপ শুভ কর্ম্মের ফল ইহ জন্মেই ঘটি-

য়াছে, এবং কুকর্ম্ম বশতঃ নহুশ ও উর্ব্বশীর যথাক্রমে জাত্যন্তর ও কার্ত্তিকেয়বনে লতারূপে অবস্থান ঘটিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মফলস্বরূপ বিপাক যদিও পুণ্য পাপ জন্য বটে, তথাপি উহারা পরম্পরায় পুণ্য পাপের জনকও হয়। দেখ যাঁহারা পুণ্যবলে যে জাতি প্রাপ্ত হয়েন তাঁহারা সেই জাতিতে কেবল পুণ্যই করেন, যেমন যোগিকুলজাত মহা-পুরুষগণ। আর যাহারা পাপবলে যে জাতি প্রাপ্ত হয় তাহারা সেই জাতিতে নিরন্তর পাপানুষ্ঠানই করে, যথা ব্যাধিকুলজাত পামরগণ। ফলতঃ সকলেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মবলে জন্ম গ্রহণ করিয়া পর পর জন্মের কারণীভূত কর্ম্ম করে সন্দেহ নাই। কিন্তু যোগীদিগের পক্ষে সেরূপ নহে। যোগীরা অত্যন্ত সুখজনক বিষয়কেও বিষসম্পৃক্ত সুস্বাদু মিষ্টান্নের ন্যায় জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করেন, এবং প্রারব্ধ কর্ম্ম অপরিহার্য্য বিবেচনায় তাহারই ফল ভোগে সন্তুষ্ট হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, কখনই পুনর্জ্জন্মকারণীভূত কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না; কর্ম্মের মধ্যে কেবল নিত্য নৈমি-ত্তিক ও চিত্তশুদ্ধিকর যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

যোগাঙ্গ অষ্টবিধ; যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ ভেদে যম পাঁচ প্রকার। প্রাণিবিনাশন স্বরূপ হিংসা পরিত্যাগকে অহিংসা কহে। এই অহিংসাকে যে সিদ্ধ করিতে পারে তাহার নিকটে স্বভাবতঃ পরস্পর বিরোধী জন্তুসকলও বৈরভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুহৃদের ন্যায় ব্যবহার করে। একারণ যে বনে যোগীরা বাস করেন, তথায় অহি, নকুল, মৃগ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি চিরবৈরাবলম্বী পশু সক-

লও সহজ সুহৃদের ন্যায় একত্র বিচরণ করে। বাক্য ও মনে মিথ্যাশূন্যতাকে সত্য কহে। সত্যসিদ্ধ ব্যক্তি যাহাকে যাহা বলেন, অবিলম্বে তাহার সে বিষয় সিদ্ধ হয়। সত্যাবলম্বীর কথা কখনই মিথ্যা হয় না; যদি কহেন "এই বন্ধ্যার পুত্র হইবে, অথবা অদ্য মধ্যাহ্নে বা অমাবস্যায় পূর্ণ চন্দ্র উদিত হইবেন" তবে ঐ ঐ বিষয়ও সিদ্ধ হয়। পরদ্রব্য অপহরণ স্বরূপ চৌর্য্যের অভাবকে অস্তেয় কহে। অস্তেয়ের অনুষ্ঠান করিলে কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না; অমূল্য রত্নাদিও সন্নিধানে উপস্থিত হয়। ইন্দ্রিয়দোষশূন্যতাকে ব্রহ্মচর্য্য কহে। ব্রহ্মচর্য্য করিলে অপ্রতিহতবীর্য্য অর্থাৎ অসাধারণ সামর্থ্য জন্মে। ভোগসাধন বিষয়ের অস্বীকারকে অপরিগ্রহ কহে। অপরিগ্রহের অনুষ্ঠান করিলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত সকল স্মৃতিপথারূঢ় হয়। এই অহিংসাদি পাঁচটী কার্য্য যদি জাতি, দেশ, কাল আর সময়কে অপেক্ষা না করিয়াই অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে ইহাদিগকেই মহাব্রত কহে। "ইনি ব্রাহ্মণ ইহাঁকে বধ করা হইবে না" "গঙ্গাতীরে কি রূপে বধ করিব" "পুণ্যাহ চতুর্দ্দশী তিথিতে বধ করা অতি অনুচিত" "যে ব্যক্তি দেবতা বা ব্রাহ্মণের প্রয়োজন ব্যতিরেকেও পরহিংসা করে সে অতি নৃশংস ও পামর" এই কয়েক প্রকার বিবেচনা করিয়া ঐ ঐ স্থলে অহিংসাদির অনুষ্ঠানকে যথাক্রমে জাতি, দেশ, কাল ও সময়কে অপেক্ষা করিয়া অহিংসানুষ্ঠান কহে। কিন্তু যোগীরা এরূপ জাত্যাদি অপেক্ষা না করিয়াই অহিংসাদির অনুষ্ঠান করেন, একারণ উহাদিগের অহিংসাদিগকে মহাব্রত বলা যায়। শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, আর ঈশ্বর প্রণিধান ভেদে

নিয়মও পাঁচ প্রকার। বাহ্য ও অভ্যন্তর ভেদে শৌচ দ্বিবিধ। মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা শরীরমলের প্রক্ষালনকে বাহ্য শৌচ, আর মিত্রতাদিদ্বারা মনোমল প্রক্ষালনকে অভ্যন্তর শৌচ কহে। সকল বিষয়ে তুষ্টিকে সন্তোষ কহে। তপস্যাদি পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

উল্লিখিত যম নিয়মের অনুষ্ঠান করিলে বিতর্কাদি বিনষ্ট হয়। বিতর্ক শব্দে হিংসাদি পাপ কর্ম্ম বুঝিতে হইবে। ঐ বিতর্ক ত্রিবিধ; কৃত, কারিত ও অনুমোদিত। স্বয়ং সম্পাদিত বিতর্ককে কৃত, আর অন্যকে নিযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা সম্পাদিতকে কারিত বিতর্ক কহে; এবং অন্যকৃত বিতর্কে অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং তদ্বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ পুরঃসর সম্মত হইলে উহাকে অনুমোদিত বিতর্ক বলা যায়। এস্থলে যখন কারিত ও অনুমোদিত বিতর্ক কৃত বিতর্কের সহিত তুল্য রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তখন "আমি স্বয়ং হিংসা করি না তবে ঐ ব্যক্তিকৃত হিংসা বিষয়ে আমার সম্মতি বা ইচ্ছা ছিল এই মাত্র, অতএব আমার এ বিষয়ে পাপ হইতে পারে না" এইরূপ যুক্তিতে যে কারিত ও অনুমোদিত দুষ্কর্ম্মের পাপজনকতা খণ্ডন, সে কেবল খণ্ডজ্ঞানীর দুরাগ্রহ মাত্র সন্দেহ নাই। যেরূপ যমস্বরূপ যোগাঙ্গের অন্তর্গত অহিংসাদির এক একটী অবান্তর ফল প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই রূপ নিয়মের অন্তর্গত শৌচাদিরও এক একটী আন্তরীয় ফল আছে। যথা শৌচানুষ্ঠান করিলে শরীরের কারণকলাপ অনুসন্ধান করিয়া শরীরে অপবিত্রতা জ্ঞান এবং নিজ শরীরের প্রতি ঘৃণা জন্মে; ঐ ঘৃণার ফল এই যে "যখন শরীর অপবিত্র হইতেছে তখন তাহার প্রতি আস্থা বা যত্ন

করা অবিধেয়” এইরূপ বিবেক উপস্থিত হইয়া নিজ শরীরের প্রতিও আগ্রহ নিবারণ করিয়া এবং তাদৃশ অপবিত্রশরীর-শালী ব্যক্তি সকলের সংসর্গ পরিত্যাগ করাইয়া যোগীর অসঙ্গত্ব সম্পাদন করে। শৌচ দ্বারা পরম্পরায় তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ বিবেকখ্যাতিও জন্মে। তাহার প্রণালী এইরূপ, শৌচ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি দ্বারা সৌমনস্য অর্থাৎ মনঃ-প্রসন্নতা, সৌমনস্য দ্বারা একাগ্রতা, একাগ্রতা দ্বারা ইন্দ্রিয় জয়, ইন্দ্রিয় জয় হইলেই উল্লিখিত বিবেকখ্যাতি সম্পাদনে সামর্থ্য জন্মে।

সন্তোষের অভ্যাস দ্বারা এক অনির্ব্বচনীয় মানসিক সুখ আবির্ভূত হয়। সমুদায় বিষয় সুখ ঐ সুখের শতাংশের একাংশও হইবে না। তপস্যার অনুষ্ঠান করিলে ইন্দ্রিয়, চিত্ত ও কায়ের অশুদ্ধি ক্ষয় হয়। ঐ অশুদ্ধি নির্ম্মূল হইলে ইন্দ্রিয় ও কায়ের এক অপূর্ব্ব শক্তি জন্মে। তদ্দ্বারা অতি সূক্ষ্ম, অত্যন্ত ব্যবহিত বা দূরবর্ত্তী বস্তু সকলও দর্শনপথে অধিরূঢ় হয়, এবং স্বেচ্ছানুসারে কখন অতি সূক্ষ্ম শরীর, কখন বা অতি বৃহৎ শরীর ধারণ করিতে পারা যায়। উল্লি-খিত স্বাধ্যায় অনুষ্ঠিত হইলে ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বর প্রণিধান করিলে ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া আন্তরিক ক্লেশকলাপের বিলয় করিয়া সমাধি সম্পাদনে সামর্থ্য প্রদান করেন। ঈশ্বর প্রণিধানের দ্বারা যেরূপ সমাধি-সামর্থ্য জন্মে ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারাও সেইরূপ জন্মে, বিশেষতঃ ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা আশু বিবেকখ্যাতি অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। ঈশ্বরের উপাসনা শব্দে ঈশ্বর বাচক প্রণব, তৎ এবং সৎ, ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণ এবং ঐ ঐ

শব্দের অর্থ যে ঈশ্বর তাঁহার নিরন্তর স্মরণ বুঝিতে হইবেক। শাস্ত্রানুসারে স্থান বিশেষে হস্তপদাদির সংস্থাপন পূর্ব্বক উপবেশনকে আসন কহে। আসন দশবিধ, পদ্মাসন, ভদ্রাসন, বীরাসন, স্বস্তিকাসন, দণ্ডকাসন, সোপাশ্রয়, পর্য্যঙ্ক, ক্রৌঞ্চ, নিষদন, উষ্ণনিষদন আর সমসংস্থাপন। ঐ ঐ আসনের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য মুনি নিরূপণ করিয়াছেন। আসনের অনুষ্ঠানে এক চমৎকার স্থির সুখের অনুভব হয়।

প্রাণবায়ুর স্বাভাবিক গতি বিচ্ছেদকে প্রাণায়াম কহে। প্রাণায়াম ত্রিবিধ; রেচক, পূরক ও কুম্ভক। অন্তর হইতে যথাশাস্ত্র প্রাণবায়ুর বহির্নিঃসারণকে রেচক, বহির্দ্দেশ হইতে অন্তরে আনয়নকে পূরক, এবং অন্তঃস্তম্ভবৃত্তিকে অর্থাৎ নিঃসারণ বা আকর্ষণ না করিয়া কেবল অন্তরে ধারণকে কুম্ভক কহে। যেরূপ পূর্ণকুম্ভস্থিত জল নিশ্চলরূপে অবস্থিত হয়, সেইরূপ কুম্ভকস্বরূপ চরম প্রাণায়ামের অনুষ্ঠানকালে প্রাণবায়ু চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চলবৃত্তি অবলম্বন করে; এইরূপে কুম্ভক প্রাণায়ামের কুম্ভের সহিত দৃষ্টান্ত ঘটে বলিয়া ইহাকে কুম্ভক প্রাণায়াম বলা যায়। প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিলে চিত্তের মলক্ষয় হয় এবং ধারণার অনুষ্ঠানে শক্তি জন্মে। যেরূপ মধুমক্ষিকা সকল মধুকররাজের অনুবর্ত্তী হয় সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ অবিকৃতস্বরূপ চিত্তের অনুবর্ত্তন করে। ঐ অনুবর্ত্তনকে প্রত্যাহার কহে। ঐ প্রত্যাহারের অনুষ্ঠানে ইন্দ্রিয় সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া বশতাপন্ন হয়, যদি কখন বিষয়াভিমুখে নীয়মান হয়, তাহা হইলে তাহাতে অনুরক্ত হয় না। নাভিচক্র বা নাসিকা-

প্রদেশে বিষয়ান্তর হইতে বিনিবৃত্ত চিত্তের স্থিরীকরণকে ধারণা কহে। অন্যান্য বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধ্যেয় বস্তুর চিন্তা-প্রবাহকে ধ্যান কহে। ঐ ধ্যানই পরিপাকাবস্থায় সমাধিপদবাচ্য হয়।

ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটী যোগাঙ্গকে সংযম এবং যোগান্তরঙ্গ কহে। ঐ তিনটী যোগাঙ্গ ইতর যোগাঙ্গ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, যেহেতু ইহারা যোগ সিদ্ধির সাক্ষাৎ কারণ। অন্যান্য যোগাঙ্গ এরূপ নহে, তাহারা পরম্পরায় যোগের কারণ, এ-কারণ অন্যান্য যোগাঙ্গকে বহিরঙ্গ কহে। উল্লিখিত ধারণাদি তিনটী যোগাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইলে কিছুই আর অজ্ঞাত থাকে না, অতীত বা অনাগত বিষয় সকলও বর্ত্তমানের ন্যায় প্রত্যক্ষ-পরিদৃশ্যমান হয়, এবং স্বেচ্ছাক্রমে আবির্ভূত ও তিরোভূত হইতে শক্তি জন্মে, অধিক কি বলিব, যোগীরা যখন যাহা ইচ্ছা করেন তখন তাহাই করিতে পারেন, তাঁহাদিগের অসাধ্য কিছুই নাই এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইতেছে। যত প্রকার সিদ্ধি জগতে প্রসিদ্ধ আছে সে সকলই যোগীদিগের হস্তগত। সিদ্ধি নানা প্রকার; তন্মধ্যে অণিমা, মহিমা, লঘিমা, গরিমা, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িত্ব এই আটটী সিদ্ধিকে * মহাসিদ্ধি কহে।

সকল ব্যক্তিরই সংসারের কারণ একমাত্র প্রকৃতিপুরুষ-সংযোগ। ঐ প্রকৃতিপুরুষ সংযোগ পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাবশতই জন্মে। ঐ অবিদ্যার বিনাশক কেবল বিবেকখ্যাতি, এতদ্ভিন্ন অবিদ্যার উন্মূলক উপায়ান্তর নাই। বিবেকখ্যাতিশব্দে, প্রকৃতি

---

* এই আটটী সিদ্ধি সাঙ্খ্যদর্শন প্রস্তাবে বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া এ স্থলে পুনর্ব্বার উহাদিগের লক্ষণাদি প্রদর্শিত হইল না।

প্রভৃতি জড় পদার্থ হইতে পুরুষ পৃথগ্‌ভূত অপৃথক্ নহে, এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানকে বুঝায়। যেমন ধন হইলে আর নির্ধনতা-স্বরূপ দৈন্য থাকে না, সেইরূপ অবিদ্যাবিরোধী বিবেকখ্যাতি যাহার চিত্তভূমিতে পদার্পণ করে, তাহার চিত্তহইতে তৎক্ষণাৎ অবিদ্যা দূরে পলায়ন করে; ইহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত সিংহ-সমাগমে গজের পলায়ন। আর যেরূপ মৃত্তিকা বিনষ্ট হইলে তৎকার্য্য শরাবাদিও বিনষ্ট হয়, সেই রূপ অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে যে তৎকার্য্য প্রকৃতিপুরুষ সংযোগ বিনষ্ট হইবে এবং প্রকৃতিপুরুষ সংযোগ বিনষ্ট হইলে যে তৎকার্য্য সংসারও এককালে বিনিবৃত্ত হইবে তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি। এইরূপে বিবেকখ্যাতি দ্বারা সংসার নিবৃত্তি হইলেই পুরুষের কৈবল্য হয়। যথা জবাসন্নিধানেই তৎপ্রতিবিম্বে স্বচ্ছ স্ফটিক-কেও রক্ত বলিয়া বোধ হয়, জবার অসন্নিধানে কখনই স্ফটিক রক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, প্রত্যুত তাহার স্বাভাবিক শুভ্রতারই অনুভব হয়, সেইরূপ পুরুষ নির্লেপ ও স্বচ্ছ হইলেও সংসার দশাতেই চিত্তগত সুখদুঃখাদির আভাস মাত্রে "আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি কর্ত্তা" ইত্যাদি অভিমানে লিপ্ত হয়েন, সংসার নিবৃত্ত হইলে আর ঐ ঐ অভিমান জন্মে না তৎকালে পুরুষের স্বাভাবিক চিন্মাত্রস্বরূপ কেবলরূপতাই থাকে। ঐ কেবলরূপতাকেই কৈবল্য ও মুক্তি কহে। যাহার বিবেকখ্যাতি উৎপন্ন হইয়াছে তাঁহার প্রজ্ঞা অর্থাৎ বুদ্ধি দ্বিবিধ; কার্য্যবিমুক্তি আর চিত্তবিমুক্তি। কার্য্যবিমুক্তি চারিপ্রকার; প্রথম যত জ্ঞাতব্য বস্তু আছে সে সকলই অবগত হইয়াছি আমার অজ্ঞাত কিছুই নাই এইরূপ জ্ঞান, দ্বিতীয় আমার সকল ক্লেশই ক্ষীণ হইয়াছে

কোন ক্লেশই নাই এইরূপ, তৃতীয় আমার দুঃখাদি অনিষ্ট সকল বিগত হইয়াছে এইরূপ, চতুর্থ আমি বিবেকখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছি এইরূপ জ্ঞান। চিত্তবিমুক্তি তিন প্রকার; প্রথম আমার বুদ্ধির গুণ সকল চরিতার্থ হইয়াছে ইহাদিগের আর প্রয়োজনান্তর নাই এইরূপ চিন্তা। দ্বিতীয় আমার সমাধি সুসম্পন্ন হইয়াছে এইরূপ চিন্তা, তৃতীয় সমাধি সুসম্পন্ন হওয়াতে আমি স্বরূপে অবস্থিত হইয়াছি এইরূপ চিন্তা। কার্য্যবিমুক্তি ও চিত্তবিমুক্তির অবান্তর ভেদ লইয়া গণনা করিলে ঐ প্রজ্ঞাকে সপ্তবিধ বলা যাইতে পারে। এই সপ্তবিধ প্রজ্ঞা ভিন্ন আর কোনরূপ প্রজ্ঞা বিবেকখ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্মে না।

যেরূপ চিকিৎসা শাস্ত্র রোগ, রোগহেতু, আরোগ্য ও আরোগ্যহেতু-ভেষজ ভেদে চতুর্ব্যূহ, সেইরূপ যোগশাস্ত্রও হেয়, হেয়হেতু, মোক্ষ ও মোক্ষহেতু ভেদে চতুর্ব্যূহ। দুঃখময় সংসারকে হেয়, প্রকৃতি পুরুষ সংযোগকে হেয়হেতু, আত্যন্তিক প্রকৃতি পুরুষ সংযোগ নিবৃত্তি স্বরূপ কৈবল্যকে মোক্ষ, আর বিবেকখ্যাতি স্বরূপ সম্যক্ দর্শনকে মোক্ষহেতু কহে।

শাঙ্কর দর্শন।

শাঙ্করদর্শন সকল দর্শন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বত্র সমাদরণীয়। পূর্ব্ব কালে যত প্রধান প্রধান অসামান্যধীসম্পন্ন পণ্ডিতবর্গ ছিলেন, তন্মধ্যে অনেকেই শাঙ্করদর্শন প্রদর্শিত-

পথের পথিক হইয়া সাধারণের সুগমতার নিমিত্ত ঐ পথেরই পরিষ্কারচ্ছলে নানাগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এ কারণ শাঙ্কর-দর্শনানুযায়ী গ্রন্থ যে কত আছে তাহার সংখ্যা করিতে পারা যায় না। অধিক কি, এক মাধবাচার্য্যই যে কত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাই নিশ্চয় করা দুষ্কর। স্বকৃত অন্যান্য গ্রন্থে শাঙ্কর দর্শন বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে, এই হেতু সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে মাধবাচার্য্য শাঙ্কর দর্শনের সংগ্রহ করেন নাই। কিন্তু মাধবাচার্য্য যে কারণে শাঙ্কর দর্শনের পরিত্যাগ করিয়াছেন, অস্মদাদির পক্ষে সে কারণের অসদ্ভাব থাকায় আমরা শাঙ্কর দর্শনের পরিত্যাগে পরাঙ্মুখ হইয়া তৎসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলাম।

এই দর্শনপ্রণালী পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হওয়াতে ইহাকে শাঙ্করদর্শন কহে, এবং শঙ্করাচার্য্য মহর্ষি বেদব্যাসকৃত বেদান্তসূত্রকে অবলম্বন করিয়া এই অদ্বৈত মত সংস্থাপন করিয়াছেন এনিমিত্ত এই দর্শনকে বেদান্তদর্শন ও অদ্বৈতদর্শনও কহে। মহর্ষি বেদব্যাস এমত অস্ফুট রূপে বেদান্তসূত্র রচনা করিয়াছেন যে তাহার তাৎপর্য্য কোনক্রমেই অনায়াসে বোধগম্য হয় না, বরং যাহার যেরূপ অভিপ্রায় হয় সে সেইরূপেই অর্থ করিতে পারে। একারণ বেদান্ত সূত্রের নানা প্রস্থান হয়, অর্থাৎ ঐ সূত্রের রামানুজকৃত ব্যাখ্যানুসারে রামানুজ প্রস্থান, মাধ্বাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যানুসারে মাধ্ব-প্রস্থান ও শঙ্করাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যানুসারে শাঙ্কর প্রস্থান হইয়াছে *। বেদান্তসূত্র চারি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং

* এতদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রস্থান আছে, কিন্তু তাহা এই ক্ষণে প্রচলিত নাই একারণ তাহার উল্লেখ করা হইল না।

অধ্যায় সকলও প্রত্যেকে চারি পাদে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথমাধ্যায়ের প্রথমপাদে ব্রহ্মের জগৎকর্ত্তৃত্বাদি, দ্বিতীয়ে ও তৃতীয়ে অস্ফুটার্থ শ্রুতি সকলের ব্রহ্মপরত্বাদি, চতুর্থে সাঙ্খ্যমতসিদ্ধ প্রধানের জগৎকর্ত্তৃত্ববোধক প্রমাণাভাসের সমন্বয়াদি। দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম পাদে অদ্বৈতমতবিরুদ্ধ শ্রুতি ও স্মৃতির সমন্বয়াদি, দ্বিতীয়ে যুক্তি ও শ্রুতিদ্বারা সাঙ্খ্য মত প্রভৃতির নিরাকরণ, তৃতীয়ে সৃষ্টিক্রমনিরূপণ-প্রসঙ্গে আকাশের নিত্যত্ব খণ্ডন ও জন্যত্ব সংস্থাপন, চতুর্থে প্রাণের নিত্যত্ববোধক শ্রুতি সমন্বয় পূর্ব্বক জন্যত্ব সংস্থাপন। তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম পাদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যানুসারে জীবের সংসার গতি ক্রমাদি, দ্বিতীয়ে জগতের অবস্থা-ভেদাদি, তৃতীয়ে বেদান্তের প্রতিপাদ্য যে ব্রহ্ম তাঁহার বিচারাদি, চতুর্থে বেদান্তসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান যে স্বতন্ত্ররূপে পুরু-যার্থসাধন তাহার নিরূপণাদি। চতুর্থাধ্যায়ের প্রথম পাদে সাধনবিষয়ক বিচারাদি, দ্বিতীয়ে বাগাদির প্রয়াণনিরূপণাদি, তৃতীয়ে অর্চ্চিরাদিমার্গ নিরূপণাদি, চতুর্থে মুচ্যমান ব্যক্তির শরীরত্যাগানন্তর পরমজ্যোতিঃপ্রাপ্তিপ্রকরণাদি নিরূপিত হইয়াছে, এবং সকল অধ্যায়েই প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য অনেক বিষয়ও প্রদর্শিত হইয়াছে।

শাঙ্করদর্শনে এক মাত্র ব্রহ্মই সত্য, আর সমুদায় জগৎই মিথ্যা, ব্রহ্ম জ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়—ইত্যাদি বিষয়-সকল প্রাধান্যরূপে শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং শাঙ্করদর্শনপ্রদর্শিত-পথাবলম্বন করিয়া চলিলেই পরমপদ মুক্তি পাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; কিন্তু যেমন, যাহার জলসর্প ধরিবারও

ক্ষমতা নাই তাহার কাল সর্প ধরিতে যাওয়া প্রকৃতফলোপযোগী না হইয়া কেবল কালকবলে কলেবর সমর্পণ করিবার নিমিত্তই হয়, সেইরূপ যিনি অধিকারী না হইয়াই কর্ম্ম কাণ্ড সকল পরিত্যাগ করিয়া শাঙ্কর দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য সর্ব্বোপাস্য নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনায় উদ্যত হয়েন; তাঁহাকে "জ্ঞানাদ্বৈ নরকম্" অর্থাৎ কেবল জ্ঞান কাণ্ডের আলোচনা করিলে নরক হয়, ইত্যাদি শ্রুতির অনুসারে কেবল নারকী হইতে হয়, ফলতঃ প্রকৃত ফলের অণুমাত্রও লাভ হয় না। এই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়াও সহজ নহে, যে ব্যক্তি, অধ্যয়ন বিধির অনুসারে বেদ ও বেদান্ত সকল অধ্যয়ন করিয়া বেদার্থ সকল এক প্রকার হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, ইহজন্মেই হউক বা জন্মান্তরেই হউক কাম্যকর্ম্ম অর্থাৎ স্বর্গাদিজনক যাগাদি, ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম অর্থাৎ নরককারক ব্রহ্মহত্যাদি হইতে নিবৃত্ত হইয়া কেবল সন্ধ্যাবন্দনাদি স্বরূপ নিত্যকর্ম্ম, নৈমিত্তিক কর্ম্ম অর্থাৎ পুত্র জননকালাদিকর্ত্তব্য জাতেষ্টি প্রভৃতি, প্রায়শ্চিত্ত এবং উপাসনা অর্থাৎ ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত শাণ্ডিল্য বিদ্যানুসারে সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক মানস উপাসনা প্রভৃতি উপাসনাকাণ্ডের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তকে নিতান্ত নির্ম্মল করিয়া, পরিশেষে সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া অভ্রান্ত হইবেন, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী, তাঁহারই ব্রহ্মজ্ঞানে ইচ্ছা করা কর্ত্তব্য, যেহেতু তাঁহারই ঐ ইচ্ছা অচিরাৎ ফলবতী হয়; অস্মদাদির ব্রহ্মজ্ঞানে ইচ্ছা করা দরিদ্রের রাজ্যাভিলাষের ন্যায় উপহাসাস্পদ মাত্র। ইহা প্রাচীন বৈদান্তিক মহাশয়েরাই স্ব স্ব গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন।

উল্লিখিত সাধন চতুষ্টয়ের প্রথম সাধন নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক, দ্বিতীয় ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগ, তৃতীয় শম দমাদি ষট্‌সম্পৎ, চতুর্থ মুমুক্ষুত্ব। নিত্যানিত্যবস্তু বিবেক শব্দে কোন্ বস্তু নিত্য আর কোন্ বস্তু অনিত্য ইহার বিবেচনাকে বুঝায়, নিত্যানিত্য বস্তুর বিবেচনা করিতে হইলে "এক মাত্র ব্রহ্মই নিত্য আর সকলই অনিত্য" এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইতেছে। ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগ শব্দে স্রক্, চন্দন, ও বনিতা-সম্ভোগাদিস্বরূপ ঐহিক সুখভোগ এবং স্বর্গভোগাদি স্বরূপ পারলৌকিক সুখভোগে যে এক কালেই বিতৃষ্ণা, তাহাকে বুঝিতে হইবে। শমাদি সম্পৎ শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধাভেদে ষড়্‌বিধ। ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত বিষয়ের শ্রবণাদি হইতে মনের নিগ্রহকে শম, বাহ্যেন্দ্রিয়কে শ্রবণাদি ভিন্ন বিষয় হইতে নিবৃত্ত করণকে দম, বিহিত কর্ম্ম সকলের বিধিপূর্ব্বক পরিত্যাগকে উপরতি, শীত বা উষ্ণতা প্রভৃতি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতাকে তিতিক্ষা, উক্তপ্রকারে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া ব্রহ্ম বা তদুপযোগি বিষয়ে মনো-নিবেশকে সমাধান, এবং গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা কহে। এবং মোক্ষেচ্ছাকে মুমুক্ষুত্ব কহে।

উল্লিখিত প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী হইয়া জ্ঞান কাণ্ডের আলোচনা করিলেই অচিরাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্তিস্বরূপ মুক্তি ভাজন হইতে পারে।

ব্রহ্ম সৎ, অর্থাৎ "সত্যস্বরূপ" চিৎ অর্থাৎ "চৈতন্যপদ-বাচ্য জ্ঞানের স্বরূপ" পরম আনন্দ স্বরূপ, অখণ্ড অর্থাৎ "অপরিচ্ছিন্ন, অদ্বিতীয়, এবং নির্ধর্ম্মক, অর্থাৎ "ব্রহ্মে জ্ঞান বা সুখাদি কোন ধর্ম্মই নাই, ব্রহ্মই স্বয়ং জ্ঞান ও সুখ-

স্বরূপ। যদিও "ঘট জ্ঞান হইতে পট জ্ঞান ভিন্ন এবং তোমার জ্ঞান হইতে আমার জ্ঞান পৃথক্" এইরূপ ভেদ ব্যবহার দর্শন করিয়া জ্ঞানের নানাত্বই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, জ্ঞানের ব্রহ্মস্বরূপতা বা সকল জ্ঞানের ঐক্য সাধক কোন যুক্তি আপাততঃ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, তথাপি বিশিষ্ট বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে বিষয়স্বরূপ উপাধির নানাত্ব লইয়াই জ্ঞনের নানাত্ব ভ্রম হয় মাত্র, বাস্তবিক জ্ঞান নানা নহে একমাত্র। যথা এক মুখই, তৈলে প্রতিবিম্বিত হইলে একরূপ, আর জলে প্রতিবিম্বিত হইলে রূপান্তর রূপে দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক ঐ ঐ স্থলে একই মুখ, মুখের ভেদ নাই, তৈলাদি রূপ উপাধির ভেদ লইয়াই ভেদ ব্যবহার হয় মাত্র, সেইরূপ জ্ঞানের ঐক্য থাকিলেও ঘট পটাদি বিষয় স্বরূপ উপাধির ভেদ লইয়াই জ্ঞানের বিভিন্নতা প্রতীতি হয়।

আর যথা এক ব্যক্তিই যখন যদ্দেশের রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হয়, তখন তাহাকে তদ্দেশের রাজা বলিতে হয়, আর যখন দেশান্তরের নৃপতি হয়েন, তখন তাহাকেই দেশান্তরের রাজাই সকলে বলে, পূর্ব্বাধিকৃত দেশের রাজা আর কেহই বলে না, সেইরূপ যখন যাহার অন্তঃকরণ বৃত্তি * দ্বারা বিষয়ের আবরণ স্বরূপ অজ্ঞান নষ্ট হইয়া জ্ঞানদ্বারা বিষয় প্রকাশমান হয়, তখনই তাহার জ্ঞান বলা যায়, আর যখন ঐরূপ না হয়, তখন তাহার জ্ঞান বলিয়াও ব্যবহার হয় না,

* অন্তঃকরণের বৃত্তি যেরূপ হয় এবং তদ্দ্বারা যেরূপে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া বিষয় প্রকাশ হয় তাহা পরে লিখিত হইবে।

অতএব জ্ঞান এক হইলেও "তোমার জ্ঞান আমার জ্ঞান" ইত্যাদি ভেদ ব্যবহারের বাধক কি আছে; বরঞ্চ জ্ঞানের ঐক্য সাধক প্রমাণই অনেক দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে এস্থলে একটী প্রমাণ মাত্র উদ্ধৃত হইতেছে; দেখ যে বস্তুর সহিত যে বস্তুর বাস্তবিক ভেদ থাকে, তাহার উপাধি পরিত্যাগ করিলেও ভেদ ব্যবহার হইয়া থাকে, যেমন ঘট ও পটের বাস্তবিক ভেদ আছে বলিয়া ঘট ও পটের উপাধি পরিত্যাগ করিলেও ভেদব্যবহারের বাধ হয় না, অতএব যদি ঘটজ্ঞান ও পট-জ্ঞানের পরস্পর বাস্তবিক ভেদ থাকিত তাহা হইলে ঐ ঐ জ্ঞানের যথাক্রমে ঘট ও পটরূপ উপাধিদ্বয় পরিত্যাগ করিলেও ভেদ ব্যবহার হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু যখন ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞানের ঘট পটরূপ উপাধি পরিত্যাগ করিয়া "জ্ঞান জ্ঞান হইতে ভিন্ন" এরূপ ভেদ ব্যবহার কেহই স্বীকার করেন না, তখন ঐ ঐ জ্ঞানের বাস্তবিক ভেদ কি রূপে সিদ্ধ হইতে পারে, বরঞ্চ ঐ ঐ জ্ঞানের ঘট পটরূপ উপাধি লইয়াই "যেহেতু ঘটজ্ঞানের বিষয় ঘট আর পটজ্ঞানের বিষয় পট অতএব ঘটজ্ঞান পটজ্ঞান হইতে ভিন্ন" এইরূপ ভেদব্যবহার হয় বলিয়া ঐ ঐ জ্ঞানের ঔপাধিক ভেদ মাত্র আছে ইহাই সিদ্ধ হইতেছে, এতদ্ভিন্ন জ্ঞান সকলের পরস্পর বাস্তবিক ভেদ সাধক কোন প্রমাণ বা যুক্তি নাই, বরং ঐক্য প্রতিপাদক শ্রুতি ও স্মৃতির প্রচুরতাই দৃষ্ট হয়, আরও যখন সামান্যতঃ জানা যাইতেছে যে ঘটজ্ঞানও জ্ঞান, আর পট-জ্ঞানও জ্ঞান, তখন ঐ ঐ জ্ঞানের কিরূপ ভেদ স্বীকার করা যাইতে পারে? অতএব ইহা সিদ্ধ হইল যে সর্ব্ববিষয়ক সকল ব্যক্তির জ্ঞানই এক, বিভিন্ন নহে, এই জ্ঞানেরই নামান্তর

চৈতন্য; চৈতন্য, জ্ঞান হইতে পৃথক্‌ভূত নহে, এবং এই জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্যই আত্মা; আত্মা, চৈতন্যভিন্ন নহে, অতএব উল্লিখিত যুক্তিক্রমে যখন জ্ঞানের ঐক্য সিদ্ধ হইতেছে তখন আত্ম-সকলের পরস্পর ঐক্য এবং পূর্ণচৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মারও যে ঐক্য সিদ্ধ হইতেছে তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি। এই জীবব্রহ্মের ঐক্যই "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, আত্মার জন্ম, স্থিতি, পরিণাম, বৃদ্ধি, অপচয় ও বিনাশরূপ ষড়্‌বিধ বিকারের মধ্যে কোন বিকারই নাই, আত্মা সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই দেদীপ্যমান রহিয়াছেন, এবং আত্মাই পরম আনন্দস্বরূপ, যেহেতু আত্মাই সকলের নিরতিশয় স্নেহের অদ্বিতীয় পাত্র, দেখ, আত্মার প্রীতির নিমিত্তই অন্যত্র পুত্র কলত্রাদিতে স্নেহ জন্মে, অন্যের প্রীতির নিমিত্ত আর কেহই কোন কালে আত্মাতে স্নেহ করে না। এস্থলে এই আপত্তি উত্থিত হইতে পারে, "যদি আত্মার আনন্দরূপতা প্রতীত না হয় তাহা হইলে আত্মার আনন্দরূপতা অজ্ঞাত রহিল, সুতরাং তাহাতে স্নেহ হইবার সম্ভাবনা কি; এই দোষ পরিহারার্থে যদি আনন্দরূপতার প্রতীতি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে আত্ম-স্বরূপ পূর্ণানন্দ থাকিতে তুচ্ছ বিষয়ানন্দ পাইবার মানসে কোন্ ব্যক্তি স্রক চন্দন ও বনিতাদির সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইত, সিদ্ধ বস্তুর নিমিত্ত কি লোকের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অতএব আত্মার আনন্দরূপতার প্রতীতি বা অপ্রতীতি উভয় পক্ষই সদোষ হইতেছে;" কিন্তু এই আপত্তি তবে বদ্ধমূল হইত, যদি আত্মার আনন্দরূপতার সম্পূর্ণ প্রতীতি বা সম্পূর্ণ অপ্রতীতি স্বীকার করা যাইত। বাস্তবিক আত্মার আনন্দরূপতা

অজ্ঞানস্বরূপ অবিদ্যার প্রতিবন্ধক বশতঃ প্রতীত হইয়াও অপ্রতীত হইতেছে, অর্থাৎ সামান্যতঃ প্রতীত হইতেছে বটে, কিন্তু বিশেষতঃ প্রতীতি হইতেছে না, ইহার অবিকল দৃষ্টান্ত, অধ্যয়নশীল ছাত্র-মধ্যস্থিত চৈত্রনামক ব্যক্তির অধ্যয়ন শব্দ। এই স্থলে অন্যান্য বালকের অধ্যয়ন রূপ প্রতিবন্ধক বশতঃ এইটী চৈত্রের অধ্যয়ন শব্দ এইরূপ বিশেষ জানা যায় না বটে, কিন্তু সামান্যতঃ এই মাত্র জানা যায় যে ইহার মধ্যে চৈত্রেরও অধ্যয়ন শব্দ আছে। পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব যুক্ত সত্ব, রজঃ, ও তমোগুণাত্মক ও সৎ বা অসৎ রূপে অনির্ণেয় পদার্থ বিশেষকে অজ্ঞান কহে, এই অজ্ঞান জগতের কারণ বলিয়া ইহাকে প্রকৃতিও কহে, অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ ভেদে দুইটী শক্তি আছে। যেরূপ মেঘ পরিমাণে অল্প হইয়াও দর্শক জনগণের নয়ন আচ্ছন্ন করিয়া বহুযোজনবিস্তৃত সূর্য্যমণ্ডলকেই যেন আচ্ছাদিত করিয়াছে, বোধ হয়, সেইরূপ অজ্ঞান, পরিচ্ছিন্ন হইয়াও যে শক্তি দ্বারা দর্শক ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি আচ্ছাদিত করিয়া যেন অপরিচ্ছিন্ন আত্মাকেই তিরোহিত করিয়া রাখিয়াছে, ঐ শক্তিকে আবরণ শক্তি কহে। আর যে শক্তি সহকারে অজ্ঞান উপাদান কারণ রূপে জগৎ সৃষ্টি করেন ঐ শক্তিকে বিক্ষেপ শক্তি কহে। এই অজ্ঞান বাস্তবিক এক হইলেও অবস্থাভেদে দ্বিবিধ মায়া আর অবিদ্যা। বিশুদ্ধ অর্থাৎ রজো বা তমোগুণ দ্বারা অনভিভূত সত্বগুণ প্রধান অজ্ঞানকে মায়া আর মলিন অর্থাৎ রজো বা তমোগুণ দ্বারা অভিভূত সত্বগুণ প্রধান অজ্ঞানকে অবিদ্যা কহে। উল্লিখিত মায়াতে পরব্রহ্মের যে প্রতিবিম্ব হয় ঐ প্রতিবিম্বই ঐ মায়াকে স্বায়ত্ত

করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন এ কারণ ঐ প্রতিবিম্বই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বনিয়ন্তা ও অন্তর্যামী স্বরূপ ঈশ্বরপদ-বাচ্য, আর অবিদ্যাতে যে পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পতিত হয় ঐ প্রতিবিম্বই ঐ অবিদ্যার বশীভূত হইয়া মনুষ্যাদি যাবৎ জীব পদ বাচ্য হয়। অবিদ্যা নানা, সুতরাং তৎ-পতিত প্রতিবিম্বও নানা বলিয়া জীবও নানা, * মায়া ও অবিদ্যাকেই যথাক্রমে ঈশ্বর ও জীবের সুষুপ্তি আনন্দময় কোষ ও কারণ শরীর কহে, এই কারণ শরীরে অভিমানী ঈশ্বর ও জীব যথাক্রমে সর্ব্বজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ পদ বাচ্য হয়েন। জীবের উপভোগের নিমিত্ত পরমেশ্বর জীবগণের পূর্ব্বকৃত সুকৃত ও দুষ্কৃত অনুসারে অপরিমিত শক্তি বিশিষ্ট মায়া সহকারে নাম রূপাত্মক নিখিল প্রপঞ্চকে প্রথমতঃ বুদ্ধিতে কল্পনা করিয়া "এইরূপ করাই কর্ত্তব্য" এই প্রকার সংকল্প করেন, পরে সেই মায়াবিশিষ্ট আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এই আকাশাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত পাঁচটী পদার্থকে পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত অপঞ্চীকৃত ভূত ও পঞ্চ তন্মাত্র কহে। " কারণগুণাঃ কার্য্যগুণমারভন্তে" অর্থাৎ কারণে যে যে গুণ থাকে তদনুরূপ গুণ কার্য্যেও উৎপন্ন হয়, এই ন্যায়ানুসারে অজ্ঞানরূপ কারণের সত্ত্ব রজ ও তম আদি গুণ ও আকাশাদি পঞ্চভূতে সংক্রান্ত হয়, কিন্তু ঐ সকল পদা-

* জীবের নানাত্ববাদ, সকল বৈদান্তিকের মত-সিদ্ধ নহে. কোন কোন বৈদান্তিক জীবের একত্ব বাদ, যুক্তি দ্বারা সংস্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু প্রায় অনেকেই জীবের নানাত্ব বাদে নির্ভর করিয়াছেন, অতএব আমরা সেই মতানুসারে জীবের নানাত্ব লিখিলাম।

র্থের জাড্যের আতিশয্য প্রযুক্ত ঐ ঐ পদার্থে তমোগুণের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে।

উল্লিখিত এক একটী পঞ্চভূতের এক একটী সত্ত্বাংশ হইতে ক্রমশঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক জন্মে। অর্থাৎ আকাশের সত্ত্বাংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সত্ত্বাংশ হইতে ত্বক্, তেজের সত্ত্বাংশ হইতে চক্ষু, জলের সত্ত্বাংশ হইতে রসনা অর্থাৎ জিহ্বা, এবং পৃথিবীর সত্ত্বাংশ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় জন্মে। আর ঐ পঞ্চভূতের পঞ্চ সত্ত্বাংশ মিলিত হইলে তাহা দ্বারা অন্তঃকরণের উদ্ভব হয়, অন্তঃকরণ, বৃত্তি অর্থাৎ অবস্থাভেদে দ্বিবিধ * বুদ্ধি আর মন। যৎকালে অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি হয়, তৎকালে বুদ্ধি, আর যখন অন্তঃকরণের সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক বৃত্তি হয়, তখন অন্তঃকরণকে মনঃপদে নির্দ্দেশ করা যায়। উক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক, বুদ্ধি ও মনের যথাক্রমে দিক্, চন্দ্র, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ, অগ্নি, চতুর্ম্মুখ ইঁহারা অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল ঐ ঐ দেবতা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি বিষয়ের উপলম্ভক অর্থাৎ

* বেদান্তপরিভাষাকার মতে অন্তঃকরণ চতুর্ব্বিধ; মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার আর চিত্ত. যে অবস্থায় অন্তঃকরণ মন ও বুদ্ধি পদ বাচ্য হয় তাহা মূল গ্রন্থেই উল্লিখিত হইয়াছে, অন্তঃকরণের অভিমানাত্মক বৃত্তি হইলে অন্তঃকরণকে অহঙ্কার আর অন্তঃকরণের অনুসন্ধানাত্মক বৃত্তি হইলে অন্তঃকরণকে চিত্ত কহে। ঐ চতুর্বিধ অন্তঃকরণের যথাক্রমে চতুর্মুখ চন্দ্র, শঙ্কর, ও অচ্যুত ইঁহারা অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হয়েন। কিন্তু বেদান্ত সার ও পঞ্চদশীকারের মতে অন্তঃকরণ, মন আর বুদ্ধি ভেদে দ্বিবিধ অহঙ্কার আর চিত্ত, মন আর বুদ্ধিরই অবস্থান্তর হইতেছে, বুদ্ধি ও মন হইতে পৃথগ্ভূত নহে, ফলতঃ বিশিষ্ট বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় উভয় মতেই ফলের ঐক্য আছে অতএব এক মত আশ্রয় করিয়া অন্তঃকরণ দ্বিবিধ বলিয়া লিখিত হইল।

প্রকাশক হয়। প্রত্যেক পঞ্চ ভূতের প্রত্যেক রজোংংশ পঞ্চক হইতে যথাক্রমে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, আর উপস্থ রূপ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় জন্মে। বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মৃত্যু, আর প্রজাপতি ইঁহারা যথাক্রমে ঐ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, ঐ ঐ দেবতার অধীন হইয়াই ঐ ঐ কর্ম্মেন্দ্রিয় যথা-ক্রমে বচন, আদান, গমন, বিসর্গ অর্থাৎ পুরীষত্যাগ, ও আনন্দ অর্থাৎ স্ত্রীসম্ভোগাদি সুখ এই কয়েকটী কর্ম্ম সম্পন্ন করে। পঞ্চভূতের সমুদিত রজোংংশ পঞ্চক হইতে প্রাণবায়ু জন্মে। প্রাণ, নিজবৃত্তিভেদে প্রাণ, অপান, সমান, উদান আর ব্যান, এই পাঁচ প্রকার * হয়। এই প্রাণ বায়ু নাসাগ্রস্থায়ী প্রাগ্-গমন আর শ্বাস প্রশ্বাসাত্মক গমনশালী, অপান পায়ু-প্রভৃতি দেশ স্থিত ও অবাগ্গমনবান্, পায়ু প্রভৃতি দেশ হইতে যে বায়ু নিঃসৃত হয় তাহাকেই অপান বায়ু কহে, সমান বায়ু শরীরের মধ্যস্থিত, এবং ভুক্ত পীত যে অন্ন পানীয়াদি তৎ সমুদায়ের পাকজনক, উদান বায়ু কণ্ঠদেশবর্ত্তী ও ঊর্দ্ধ-গমনশীল, এবং ব্যান বায়ু অখিল শরীর সঞ্চারী এবং সমুদায় দেহস্থায়ী। পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধি, জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক সহিত বিজ্ঞান-ময় কোষ, এবং মন কর্ম্মেন্দ্রিয় সহকারে মনোময় কোষ, আর কর্ম্মেন্দ্রিয় সহিত প্রাণ, প্রাণময় কোষ হয়। এই তিন কোষের

* মতান্তরে নাগ কূর্ম্ম কৃকর দেবদত্ত এবং ধনঞ্জয় নামে আরও অন্য পাঁচটী বায়ু আছে, নাগ বায়ু উদ্গিরণকর, কূর্ম্ম বায়ু নিমীলন কর, কৃকর বায়ু ক্ষুধাকর. দেবদত্ত বায়ু জৃম্ভনকর, এবং ধনঞ্জয় বায়ু পোষণকর. কিন্তু বেদান্তসারকার প্রভৃতির মতে এই পাঁচটী বায়ু প্রাণাদি পঞ্চবায়ুরই অন্তর্গত, পৃথগ্ভূত নহে, অতএব এস্থানে বায়ু পঞ্চকেরই উল্লেখ করা হইল।

মধ্যে বিজ্ঞানময় কোষ, জ্ঞানশক্তিমান এবং কর্ত্তৃত্বশক্তি সম্পন্ন, মনোময় কোষ, ইচ্ছাশক্তিশীল এবং করণ স্বরূপ, আর প্রাণময় কোষ, ক্রিয়াশক্তিশালী ও কার্য্যস্বরূপ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চপ্রাণ বুদ্ধি আর মন এই সপ্তদশটী পদার্থ মিলিত হইয়া সূক্ষ্ম শরীর হয়, ঐ সূক্ষ্ম শরীরকেই লিঙ্গ শরীর কহে, লিঙ্গ শরীর ইহলোক ও পরলোক গামী এবং মুক্তি-পর্য্যন্ত স্থায়ী। এই এক এক লিঙ্গ শরীরের অভিমানী জীবকে তৈজস আর সকল লিঙ্গ শরীরের অভিমানীকে হিরণ্যগর্ভ কহে, ঈশ্বর, জীবের উপভোগ সম্পাদক স্থূল বিষয়ের সম্পাদনার্থে পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতের পঞ্চীকরণ করেন, তাহারও প্রণালী এইরূপ “ পরমেশ্বর আকাশাদি প্রত্যেককে প্রথমতঃ দুই দুই অংশে বিভক্ত করেন, পরে প্রত্যেক ভূতের ঐ এক একটি অংশকে চারি চারি খণ্ড করিয়া পূর্ব্বকৃত আকাশের দুই খণ্ডের যে এক খণ্ড আছে তাহাতে বায়ু তেজ জল ও পৃথিবীর চারি চারি খণ্ডের মধ্যে সকলেরই এক একটী খণ্ড দিয়া স্থূলা-কাশের এবং পূর্ব্বস্থিত বায়ুর এক অংশে আকাশ, তেজ, জল ও পৃথিবীর ঐ চারি চারি খণ্ড হইতে এক এক খণ্ড দিয়া স্থূল বায়ুর এবং ঐ রীতিক্রমে স্থূল তেজ জল ও পৃথিবীরও সৃষ্টি করেন। এইরূপে পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতকেই পঞ্চ স্থূলভূত কহে। এই স্থূল ভূতেই শব্দাদি গুণের অভিব্যক্তি অর্থাৎ প্রকাশ হয়। যদিও সূক্ষ্ম ভূতেও শব্দাদি গুণ আছে তথাপি তাহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া অনুভূত হয় না। আকাশের গুণ প্রতিধ্বনি-স্বরূপ শব্দ, বায়ুর গুণ “বীসী” এইরূপ অব্যক্ত শব্দ ও অনুষ্ণা-শীত অর্থাৎ “ না শীত না উষ্ণ মধ্যমরূপ স্পর্শ, তেজের উষ্ণস্পর্শ, ভুগু ভুগু এইরূপ অনুকরণশব্দ, জলের চুলু চুলু এই

রূপ অনুকরণশব্দ, শীতস্পর্শ, শুক্লরূপ, এবং মধুর রস, এবং পৃথিবীর গুণ কড়কড়া এইরূপ অস্ফুটশব্দ, কঠিনস্পর্শ, শুক্ল নীল ও পীতাদি নানা রূপ, কটু, কষায়, তিক্ত, অম্ল, লবণ ও মধুর এই ছয় রস, এবং সুরভি ও অসুরভিভেদে গন্ধদ্বয় আছে। যেরূপ পরমেশ্বর পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ করেন, সেইরূপ তেজ জল ও পৃথিবী এই তিন ভূতের ত্রিবৃৎ করণও করেন, তাহা এইরূপ; পরমেশ্বর পৃথিবী জল ও তেজ এই তিনটী ভূতকে প্রথমতঃ দুই দুই অংশে বিভক্ত করেন, পরে প্রত্যেকের ঐ এক এক অর্দ্ধাংশকে পুনরায় দুই দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া পৃথিবীর অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশে জলের এবং তেজের ঐ এক এক খণ্ড দিয়া মিশ্রিত করেন এবং অবশিষ্ট জলের অর্দ্ধাংশে পৃথিবী ও তেজের ঐ এক এক খণ্ড দিয়া ত্রিবৃৎ কৃত জল ও তেজের সৃষ্টি করেন। এইরূপে পঞ্চীকৃত* ও ত্রিবৃৎ-কৃত স্থূলভূত হইতেই যথাসম্ভব ভূর্, ভুবর্, স্বর্, মহর্, জনর্, তপর্, আর সত্য এই সাতটী ক্রমশঃ উপরি উপরি বর্ত্তমান ঊর্দ্ধতন লোক, আর অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল মহাতল, পাতাল, এই সপ্ত যথাক্রমে অধোঽধো বর্ত্তমান অধস্তন লোক ও স্থূল শরীর এবং অন্নপানীয়াদির উৎপত্তি হয়। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ আর উদ্ভিজ্জ ভেদে স্থূলশরীর চতু-

* পঞ্চীকৃত পৃথিবীতে পৃথিবীর ।৷৹ আট আনা, আর চারি ভূতের ৵ দুই দুই আনা করিয়া আট আনা আছে, পঞ্চীকৃত জলাদিতেও এইরূপ জানিবে। ত্রিবৃৎ কৃত পৃথিবীতে পৃথিবীর ।৷৹ আট আনা আর জলের ।৹ চারি আনা ও তেজের ।৹ চারি আনা আছে. ত্রিবৃৎ কৃত জলে জলের ।৷৹ আট আনা পৃথিবীর ।৹ চারি আনা তেজের ।৹ চারি আনা আছে, ত্রিবৃৎ কৃত তেজেতেও এইরূপ জানিবে।

বিধ। জরায়ুতে* যে শরীরের উৎপত্তি হয় তাহাকে জরায়ুজ কহে, ঐ শরীর মনুষ্য ও পশ্বাদির। অণ্ড অর্থাৎ ডিম্ব হইতে যে শরীরের উৎপত্তি হয় তাহাকে অণ্ডজ কহে; ঐ শরীর পক্ষী ও সর্পাদির। স্বেদ অর্থাৎ উষ্ম হইতে যে শরীরের উৎপত্তি হয় তাহাকে স্বেদজ কহে; ঐ শরীর মশক ও বৃশ্চিকাদির। এবং ঊর্দ্ধ ভেদ করিয়া অর্থাৎ মৃত্তিকা ভেদ করিয়া যে শরীরের উৎপত্তি হয় তাহাকে উদ্ভিদ্ কহে; ঐ শরীর লতা ও বৃক্ষাদির। বৃক্ষাদিরও চৈতন্য আছে, এবং পুণ্য পাপের ভোগ হয় বলিয়া উহাদিগেরও শরীর স্বীকার করিতে হয়। এই স্থূল দেহ সকলের অভিমানীকে বৈশ্বানর এবং এক এক স্থূল শরীরাভিমানী জীবকে বিশ্ব কহে। এই স্থূল দেহই অন্নময়কোষপদবাচ্য; ঐ স্থূলদেহের কান্তি ও পুষ্টির কারণ অন্ন ও পানীয়াদির ভক্ষণ। অন্ন উদরস্থ হইলে তাহার স্থূলাংশে পুরীষ, মধ্যম অংশে মাংস, এবং সূক্ষ্মাংশে মনের পুষ্টি হয়, আর পীত পানীয়াদি বস্তুর স্থূল, মধ্যম ও সূক্ষ্মাংশ যথাক্রমে মূত্র, রক্ত ও প্রাণের পুষ্টি রূপে পরিণত হয়। আর ঘৃতাদি ভক্ষণ করিলে ঐ ঘৃতাদির স্থূল, মধ্যম ও সূক্ষ্ম অংশ ক্রমশঃ অস্থি, মজ্জা ও বাক্‌শক্তি রূপে পরিণত হয়।

যদিও বাস্তবিক পরব্রহ্ম ভিন্ন সকল বস্তুই মিথ্যা, এই জগতে যে কিছু বস্তু দৃষ্ট হইতেছে তৎসমুদায়ই রজ্জুসর্পের ন্যায় অজ্ঞান কল্পিত মাত্র, এবং জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ভেদ নাই, জীবাত্মাই পরমাত্মা আর পরমাত্মাই

---

* জরায়ুশব্দে গর্ভবেষ্টন চর্ম্মস্থালীকে বুঝায়, গৌড়দেশে যাহাকে ফল কহে।

জীবাত্মা, অতএব এই জগতের সৃষ্টিক্রম এবং জীবাত্মা ও পর-মাত্মার বিভাগ ইত্যাদি করা বন্ধ্যার পুত্রের নামকরণের ন্যায় উপহাসাস্পদ এবং " দ্বৈতাদ্বৈ ভয়ম্ " ইত্যাদি শ্রুতির অনুসারে অধর্ম্মজনক হইতেছে; তথাপি যেরূপ বালককে তিক্ত ঔষধ সেবন করাইতে হইলে প্রথমতঃ মিষ্ট দ্রব্য দিতে হয়, নতুবা কখনই তাহার তিক্ত ঔষধ সেবনে প্রবৃত্তি জন্মে না, যদিও ঐ বালকের পক্ষে মিষ্ট দ্রব্য অপকারক এবং তিক্ত দ্রব্য উপকারক হইতেছে বটে, কিন্তু ঐ বালক বাল্য দোষে দূষিত হইয়া আপাততঃ রমণীয় মিষ্ট দ্রব্যকেই উপকারক, আর দুঃসেব্য বলিয়া তিক্ত ঔষধকে অপকারক বিবেচনা করে, সেই রূপ সাক্ষাৎ প্রতীয়মান আপাততঃ সুখকর জগতের মিথ্যাত্বপ্রভৃতি স্বীকারও নিশ্চয়রূপে হৃদয়ঙ্গম করা অজ্ঞানদোষে দূষিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে কোন প্রকারেই সম্ভবে না, বরং জগতের সত্যত্বেরই যৌক্তিকতা ও ঔচিত্য হৃদয়ে উদিত হয়; অতএব অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নির্গুণ, নির্ব্বিকার ও নিরাকার পরব্রহ্ম হঠাৎ বুদ্ধিপ্রবিষ্ট হওয়া অত্যন্ত অসম্ভাবিত বিবেচনা করিয়া প্রথমতঃ জগতের সত্যত্বাদি স্বীকার করিয়াই সৃষ্টিক্রমাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। কিঞ্চ যথা মরুমরীচিকায় জলভ্রম হইলে যত-ক্ষণ ঐ ভ্রান্তিকল্পিত জলের স্বরূপ ও কারণাদির অনুসন্ধান রূপ তত্ত্বানুসন্ধান না হয়, ততক্ষণ ঐ জলকে কোন মতেই মিথ্যা বোধ হয় না, সত্য বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু যখন তত্ত্বানুসন্ধানদ্বারা ঐ কল্পিতজলের স্বরূপ ও কারণাদি অবগত হওয়া যায়, তখন আর ঐ জলকে সত্য বলিয়া বোধ হয় না, তখন সত্যস্বরূপ মরুমরীচিকারই প্রকাশ হয়, সেইরূপ যত

কাল পরব্রহ্মে পরিকল্পিত এই জগতের স্বরূপ ও কারণাদির অনুসন্ধান না হইতেছে, তত কাল পর্য্যন্ত জগৎ অসৎ হইয়াও সৎরূপে প্রতীত হইতেছে; কিন্তু যখন ইহার স্বরূপ ও কারণাদির নিরূপণ দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হইবে, তখন আর জগৎ সত্য বলিয়া প্রতীত হইবে না, অসৎ বলিয়াই বোধ হইবে, এবং তৎকালে সত্য স্বরূপ পরব্রহ্মই কেবল প্রকাশমান হইবেন। অতএব জগৎ বাস্তবিক মিথ্যা হইলেও জগৎকে সত্য বলিয়া সৃষ্টিক্রমাদির প্রদর্শন করা কেবল জগতের মিথ্যাত্ব নিরূপণের নিমিত্ত হইতেছে, সুতরাং অদ্বৈতমত প্রদর্শন-প্রস্তাবে সৃষ্টিক্রমাদি প্রদর্শন অবশ্য কর্ত্তব্য ও প্রকৃতোপযোগী সন্দেহ নাই। উল্লিখিত রূপে অজ্ঞান নিবৃত্তি পর্য্যন্ত সংসারদশায় জগতের সত্যত্ব প্রতীতি হয় বলিয়া সংসারদশায় জগৎ সৎ আর তদন্তে জগৎ অসৎ; অতএব জগতের সত্যত্ব ও অসত্যত্ব উভয়ই বিরুদ্ধ হইতেছে না। পরমেশ্বর উল্লিখিতরূপে কত দিন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন নির্ণয় করা যায় না এবং "এই অবধি জগৎ সৃষ্টি করিলেন, ইহার পূর্ব্বে জগৎ ছিল না" এরূপ কল্পনা করিলেও নানা দোষ ঘটে বলিয়া সংসারের অনাদিত্ব স্বীকার করিতে হয়।

এস্থলে কেহ কেহ এই আপত্তি করেন যে, "সংসার শব্দে দৃশ্যমান পদার্থকে বুঝায়, সুতরাং যখন সকল বস্তুকেই সাদি দেখিতেছি তখন আর সংসারের অনাদিত্ব কোথায় রহিল"। কিন্তু এ আপত্তি কেবল অনাদি শব্দের তাৎপর্য্যার্থের অজ্ঞানবিলসিতমাত্র বলিতে হইবে; যেহেতু অনাদি শব্দের এরূপ অর্থে তাৎপর্য্য নহে, কিন্তু "সংসার, প্রলয়, পুনঃ সংসার, পুনঃ প্রলয় ও পুনঃ সংসার" এইরূপ

সংসার প্রবাহের আদি নাই এই অর্থেই তাৎপর্য্য। অতএব যথন দৃশ্যমান প্রবাহের আদি দৃষ্ট হইতেছে না, তখন কেবল দৃশ্যমান কয়েকটী বস্তুর সাদিত্ব দর্শন করিয়া সংসারের অনাদিত্ব খণ্ডিত হইতে পারে না। যেরূপ মায়াবী ঐন্দ্র-জালিক বিদ্যা দ্বারা ঐন্দ্রজালিক বস্তু সকল প্রকাশ করিয়া জনগণের দর্শনৌৎসুক্য নিবারণ করিয়া পুনর্ব্বার ঐ সকল বস্তুর সংহার করে, সেইরূপ পরমেশ্বর অচিন্ত্যশক্তিশালি মায়াসহকারে জগৎ সৃষ্টি করিয়া জনগণের সুকৃত ও দুষ্কৃতের ফল প্রদানান্তে পরিশেষে জগতের প্রলয় করেন।

প্রলয় চারি প্রকার; নিত্য, প্রাকৃত, নৈমিত্তিক ও আত্যন্তিক। সুষুপ্তিকে অর্থাৎ যে অবস্থায় অত্যন্ত নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির ঘট পটাদিবিষয়ের জ্ঞানাদি না হয় সেই অবস্থা-বিশেষকে নিত্য প্রলয় কহে। ঐ নিত্য প্রলয় হইলে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সংস্কার এবং লিঙ্গশরীর প্রভৃতি কয়েকটী পদার্থমাত্র কারণরূপে অবস্থিত হয়, আর সকল বস্তুর প্রলয় হইয়া যায়, কিন্তু ঐ নিত্যপ্রলয়স্বরূপ সুষুপ্তির ভঙ্গ হইলেই পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত সংসার জন্মে, এ জন্য ঐ প্রল-য়ের আপাততঃ অনুভব হয় না। জীবগণের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ভেদে যে তিনটী অবস্থা আছে, তন্মধ্যে নিত্য প্রলয়স্বরূপ সুষুপ্তিই সর্ব্বাপেক্ষায় উৎকৃষ্ট; এই অবস্থায় জীবের পরব্রহ্ম ভাব উপস্থিত হইয়া কেবল পরমানন্দের অনুভব হয়, তৎকালে আর কিছুই অনুভূত হয় না। কার্য্য-ব্রহ্মার লয়নিবন্ধন সকল কার্য্যের বিলয়কে প্রাকৃত লয় কহে। উহার রীতি এইরূপ; যিনি অতি কঠোর তপস্যাদির অনুষ্ঠান দ্বারা "ব্রহ্মাণ্ডাধিকারী" অর্থাৎ ব্রহ্মত্বপদ প্রাপ্ত হই-

য়াছেন, এবং এই রূপ প্রারব্ধ কর্ম্ম সঞ্চিত করিয়া, ঐ ব্রহ্মত্বপদ প্রাপ্তির পূর্ব্বেই হউক বা পরেই হউক, জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানীও হইয়াছেন, তিনি প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডাধিকার অনিচ্ছাপূর্ব্বকও অধিকৃত করিয়া, পরিশেষে ঐ রূপ ফলভোগ দ্বারা ঐ কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই "বিদেহ কৈবল্য" নামক পরম মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন, তৎকালে ঐ ব্রহ্মার অধিকৃত ব্রহ্মলোকে যত ব্রহ্মজ্ঞানী থাকেন, তাঁহারাও ঐ ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হয়েন; এইরূপ ব্রহ্মাকেই কার্য্যব্রহ্মা এবং তাঁহার ঐরূপ মুক্তিকেই কার্য্যব্রহ্ম-বিলয় কহে। ঐরূপ কার্য্যব্রহ্মার লয় হইলে তাঁহার অধিকৃত ব্রহ্মাণ্ডেরও মায়াতে লয় হয়; ঐ রূপ লয়কেই কার্য্যব্রহ্মার লয়নিবন্ধন সকল কার্য্যের লয় কহে। উক্ত রূপে মায়াত্মক প্রকৃতিতে ঐ লয় হয় বলিয়া উহাকে প্রাকৃতলয়ও কহে। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যব্রহ্মার দিনাবসান নিমিত্তক ত্রৈলোক্যের লয়কে নৈমিত্তিক প্রলয় কহে। কার্য্যব্রহ্মা নিজ দিনাবসানে ব্রহ্মাণ্ডকে আত্মসাৎ করিয়া শয়ন করেন এবং নিজরাত্রির অবসানে গাত্রোত্থান করিয়া পুনরায় জগৎ সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার দিবা ও রাত্রির পরিমাণও সামান্য নহে; অস্মদাদির * চতুর্যুগসহস্র-পরিমিতকালে ব্রহ্মার এক দিন আর ঐ রূপ কালে এক রাত্রি হয়। ব্রহ্মার এতাদৃশ প্রকাণ্ড রাত্রির মধ্যে লোকত্রয়ের কিছুই থাকে না কেবল নৈমিত্তিক প্রলয় মাত্র থাকে, অতএব নৈমিত্তিক প্রলয়ের পরিমাণ ও চতুর্যুগসহস্র। ব্রহ্মজ্ঞাননিমিত্তক পরম মুক্তি প্রাপ্তিকে আত্যন্তিক প্রলয় কহে। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সংসারের মূল কারণ মূলাজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে আর

* সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগ।

সংসারস্থিতির বা পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা কি? ঐ প্রলয় হইলে আর সংসার জন্মে না বলিয়া ইহার "আত্যন্তিক প্রলয়" এই নামটী যৌগিক হইতেছে। প্রলয়ের ক্রম এইরূপ; প্রথমতঃ পৃথিবীর লয় জলে হয়, জলের লয় তেজে, তেজের লয় বায়ুতে, বায়ুর লয় আকাশে, আকাশের লয় জীবের অহঙ্কারে, তাহার লয় হিরণ্যগর্ভের অহঙ্কারে এবং তাহার লয় অজ্ঞানে হয়; এই রূপ "কার্য্যলয়ক্রমেই কারণের লয়" এই সিদ্ধান্তের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অন্যান্য বস্তুরও লয়ক্রম কল্পনা করিতে হইবে। এই রূপ লয়ক্রমই বিষ্ণুপুরাণাদিতে উক্ত হইয়াছে বলিয়া ইহাই প্রামাণিক, এতদ্ভিন্ন অন্যমতসিদ্ধ লয়ক্রমে কোন প্রমাণ বা যুক্তি নাই।

প্রমাণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, আগম, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি ভেদে ষড়্বিধ। প্রত্যক্ষ নামক জ্ঞানের করণ-স্বরূপ শ্রোত্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয়কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কহে। জ্ঞান বৃত্তি ও ফলভেদে দ্বিবিধ। যথা জলাশয়স্থিত জল ছিদ্র হইতে নির্গত হইয়া প্রণালিকা দ্বারা কেদারখণ্ডে* প্রবেশ করিয়া কেদারাকারে অর্থাৎ কেদারের যে রূপ চতুষ্কোণাদি আকার থাকে সেইরূপ আকারে পরিণত হয়, তথা প্রত্যক্ষ স্থলে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সংযোগ হইলে অন্তঃকরণ ঐ ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ে নিপতিত হইয়া বিষয়ের যে রূপ আকার থাকে সেই রূপ আকারে পরিণত হয়, ঐ পরিণামকেই বৃত্তিরূপ-জ্ঞান কহে। বৃত্তিরূপজ্ঞান দ্বারা বিষয়ের অজ্ঞান নষ্ট হয়, আর ফলরূপজ্ঞান দ্বারা বিষয়ের স্ফূর্ত্তি অর্থাৎ প্রকাশ হয়। ফলরূপ-জ্ঞান পরব্রহ্ম স্বরূপ চৈতন্য, সুতরাং ফলরূপজ্ঞান নিত্য। যদি

* কেদার শব্দে ক্ষেত্রকে বুঝায়।

অজ্ঞান দ্বারা ঘটাদি বিষয় আবৃত না থাকিত তাহা হইলে সর্ব্বদাই ঘটাদি বিষয় অনুভূয়মান হইত, কাহারই কখন কোন বিষয় অজ্ঞাত থাকিত না, কাণ ব্যক্তিরও সকল বস্তু প্রত্যক্ষ হইত, জ্ঞানের নিমিত্ত আর ইন্দ্রিয়গণের আবশ্যকতা থাকিত না। ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা কেবল বিষয়ের আবরণ স্বরূপ অজ্ঞানের নিরাস হয় বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়াদিরূপ কারণের আবশ্যকতা আছে; যেহেতু ঐ আবরণ নষ্ট না হইলে বিষয়ের স্ফূর্ত্তি হয় না। অতএব ফলরূপ জ্ঞান নিত্য হইলেও উক্ত আবরণের প্রতিবন্ধকতাবশতঃ সর্ব্বদা সকলের সর্ব্ব বিষয়ের প্রকাশ হয় না। যখন যাহার উল্লিখিত বৃত্তিরূপ জ্ঞান দ্বারা যে বিষয়ের অজ্ঞান নষ্ট হয়, তৎকালেই তাহার সম্বন্ধে সেই বিষয়ের স্ফূর্ত্তি হয়, আর যখন এরূপ না হয় তখন ঐ রূপ প্রকাশও হয় না। অতএব ইহা সিদ্ধ হইল, ফলরূপজ্ঞান নিত্য হইয়াও অজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতাবশতঃ জন্যের ন্যায় কারণনিয়ম্য ও অসার্ব্বত্রিক হইতেছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের অন্যান্য বিশেষ ধর্ম্ম, অনুমান, উপমান ও আগমাদির অর্থাৎ শব্দাদি প্রমাণের বিষয় ও স্বরূপাদি ন্যায়দর্শন প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে; ন্যায়মত-বিরুদ্ধ যে যে বিশেষ আছে তাহা সংস্কৃত ভাষাতেই চমৎকৃত এবং সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হয়, প্রচলিত বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইলে তাদৃশ রমণীয় বা সুস্পষ্ট হওয়া কঠিন, এ বিবেচনায় তাহা উদ্ধৃত হইল না।

অর্থাপত্তি (কল্পনা) রূপ প্রমিতির করণকে অর্থাপত্তি প্রমাণ কহে। যাহা ব্যতিরেকে যাহা অসম্ভাবিত হয়, তাহার উপপাদ্য সে হয়। আর যাহার অসম্ভবে যাহার অসম্ভব হয়, সে তাহার উপপাদক হয়; যথা দিবাতে অভোজী

ব্যক্তির শরীর স্থূলতা উপপাদ্য, আর রাত্রিভোজন উপপাদক; যেহেতু দিবাতে অভোজী ব্যক্তির শরীরস্থূলতা উহার রাত্রি-ভোজন ব্যতীত কোন মতেই সম্ভবে না। অতএব যখন দিবাতে অভোজী ব্যক্তির শরীরস্থূলতা দৃষ্ট বা শ্রুত হইবেক, তখন ঐ ব্যক্তির রাত্রিভোজন সাক্ষাৎ দৃষ্ট না হইলেও অর্থাপত্তি প্রমাণ দ্বারা কল্পিত হইবে। দৃষ্টার্থাপত্তি ও শ্রুতার্থাপত্তি ভেদে অর্থাপত্তি প্রমাণ দ্বিবিধ। দৃষ্ট ও শ্রুত বস্তুতে উপ-পাদ্যের অনুপপত্তি দ্বারা উপপাদকের কল্পনাকে যথাক্রমে দৃষ্টার্থাপত্তি ও শ্রুতার্থাপত্তি কহে। যেমন দৃশ্যমান ঐন্দ্র-জালিক বস্তুর নিষিধ্যমানত্ব রূপ উপপাদ্য জ্ঞান দ্বারা তদুপ-পাদক মিথ্যাত্বের কল্পনাকে দৃষ্টার্থাপত্তি, আর "জীবিত দেব-দত্ত গৃহে নাই" এই শব্দ শ্রবণানন্তর জীবিত ব্যক্তির বহিঃসত্ত্ব-ব্যতিরেকে কোন মতেই গৃহে অসত্ত্ব সম্ভবে না—এই রূপ অনুপপত্তি জ্ঞান দ্বারা উহার বহিঃসত্ত্ব কল্পনাকে শ্রুতার্থাপত্তি কহে। শ্রুতার্থাপত্তিও অভিধানানুপপত্তি ও অভিহিতানুপ-পত্তি ভেদে দ্বিবিধ। বাক্যের একদেশ মাত্র শ্রবণ করিয়া দেশান্তরের কল্পনাকে অভিধানানুপপত্তি কহে। যথা "দ্বারম্" অর্থাৎ দ্বারকে, এই মাত্র শ্রবণ করিয়া "পিধেহি" অর্থাৎ পিধান (আবরণ) কর, এই পদের কল্পনা। শ্রুত অর্থের সম্ভব-পরত্ব প্রতিপাদনার্থে অর্থান্তরের কল্পনাকে অভিহিতানুপপত্তি কহে। যথা "অদ্য পঙ্গু ব্যক্তি অতি দূরদেশ হইতে আগত হইল, ইহা শ্রুত হইলে, পঙ্গুর গতি শক্তি না থাকা প্রযুক্ত তাহার দূর হইতে আগমন অসম্ভব, এই রূপ অনুপপত্তি জ্ঞান দ্বারা তদুপপাদক শকটাদি রূপ দ্বার কল্পনা।

প্রতিযোগীর যোগ্যানুপলম্ভকে অনুপলব্ধি প্রমাণ কহে।

কোন বস্তুর অভাব হয় তাহার প্রতিযোগী সেই বস্তুই হয়, যেমন ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘট, এবং পটাভাবের প্রতিযোগী পট। যে যে কারণ সত্ত্বে প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষ হয়, সেই সেই কারণের সদ্ভাব থাকিলেও কেবল প্রতিযোগীর অসত্ত্ব নিবন্ধন যে প্রতিযোগীর অপ্রত্যক্ষ তাহাকে যোগ্যানুপলব্ধি কহে। এই যোগ্যানুপলব্ধি কোন্ স্থলে সম্ভবে ও কোন্ স্থলেই বা উহার দ্বারা অভাবের প্রতীতি হয়, ইহার নিশ্চয় করিতে হইলে এই মাত্র স্থির করিতে হইবে "যদি অমুক বস্তু এই স্থানে থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার প্রত্যক্ষ হইত"। এই রূপ প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষের আপত্তি যে স্থানে উত্থাপিত হইতে পারে সেই স্থানেই উল্লিখিত প্রমাণ দ্বারা অভাবের অনুভব হয়, আর যে স্থলে ঐ রূপ আপত্তি না হয় সে স্থানে অভাবের অনুভব হয় না; যথা উজ্জ্বলালোকান্বিত আলয়ে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির "যদি এই গৃহে ঘট থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই এস্থলে ঘটের প্রত্যক্ষ হইত" এই রূপ আপত্তি উত্থাপিত হয় বলিয়া ঐ স্থলে ঐ ব্যক্তির ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ হয়। আর অন্ধ ব্যক্তির বা অন্ধকার গৃহে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির ঐ রূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না বলিয়া উক্ত স্থলে উক্ত প্রমাণ দ্বারা অভাবেরও প্রতীতি হয় না। এই অনুপলব্ধি প্রমাণ দ্বারা কেবল অভাবেরই অনুভব হয়, এবং ইহা অভাবস্বরূপ, এ কারণ এই প্রমাণকে কোন কোন পণ্ডিত অভাব প্রমাণ কহেন। অভাব চতুর্বিধ; প্রাগভাব, ধ্বংস, অত্যন্তাভাব ও ভেদ। ন্যায়মতে প্রাগভাবাদির লক্ষণ যেরূপ, এমতেও প্রায় সেইরূপ; বিশেষ এই, ন্যায় মতে ধ্বংসের ধ্বংস স্বীকার নাই, এ মতে তাহা স্বীকৃত হই-

য়াছে, এবং ন্যায়মতে ভেদ এক রূপ, এ মতে ভেদ দ্বিবিধ; সোপাধিক ও নিরুপাধিক *। যথা আকাশ এক হইলেও ঘট ও মঠরূপ উপাধি দ্বয়ের ভেদ লইয়া "ঘটাকাশ হইতে মঠাকাশ ভিন্ন" এ রূপ যে ভেদ ব্যবহার হয় তাহাকে ঔপাধিক ভেদ আর ঘট ও মঠের পরস্পর ভেদকে নিরুপাধিক ভেদ কহে।

উল্লিখিত ষড়্‌বিধ প্রমাণ দ্বারাই যাবতীয় পদার্থের সিদ্ধি হইবেক; ঐ ষড়বিধ প্রমাণাতিরিক্ত আর প্রমাণ নাই। পৌরাণিকেরা সম্ভব ও ঐতিহ্য নামক যে অতিরিক্ত প্রমাণ দ্বয় স্বীকার করেন তাহাতে কোন প্রমাণ বা প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না বলিয়া তাহা প্রমাণরূপেই গণ্য হইতে পারে না। "যাহার লক্ষ মুদ্রা আছে তাহার শত বা সহস্র মুদ্রা থাকা সম্ভব" এই রূপ সম্ভাবনাকে সম্ভব প্রমাণ কহে, আর "এই বটবৃক্ষে যক্ষ আছে" এই রূপ প্রবাদ পরম্পরাকে ঐতিহ্য প্রমাণ কহে, এই ঐতিহ্য প্রমাণ দ্বারা ঐ বটবৃক্ষে যক্ষ আছে সিদ্ধ হইবেক। এইরূপ পৌরাণিক পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন; কিন্তু বিশিষ্ট বিবেচনা করিলে বোধ হইবে সম্ভবপ্রমাণ অনুমানের অন্তর্গত, অনুমান হইতে বিভিন্ন নহে, এবং ঐতিহ্য প্রমাণের মধ্যে প্রায় অনেক ঐতিহ্য প্রমাণের প্রামাণ্যই নাই, আর যাহার আছে সে শব্দ প্রমাণের অন্তর্গত। অতএব ইহা সিদ্ধ হইল যে, প্রত্যক্ষাদি ষড়্‌বিধ প্রমাণাতিরিক্ত আর প্রমাণান্তর নাই। এই ষড়্‌বিধ প্রমাণ দ্বারা বুদ্ধিমান্ জনগণ ঐহিক ও পারত্রিক সুখ সম্ভো-

* উপাধির ভেদ লইয়া কল্পিত যে ভেদ তাহাকে সোপাধিক এবং বাস্তবিক যে ভেদের কালত্রয়ে বাধ হয় না তাহাকে নিরুপাধিক ভেদ কহে।

গাদির অস্থিরত্বাদি দোষ দর্শন করিয়া পরম সুখস্বরূপ পরাৎপর পরব্রহ্ম প্রাপ্তির নিমিত্ত তৎসাধনীভূত-তত্ত্ব-জ্ঞানেচ্ছু হইয়া উহার উপায় স্বরূপ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন।

ষড়্‌বিধ লিঙ্গদ্বারা সকল বেদান্তেরই পরব্রহ্মে তাৎপর্য্যাবধারণকে শ্রবণ কহে। ঐ ষড়্‌বিধ লিঙ্গের প্রথম লিঙ্গ উপক্রম ও উপসংহার, দ্বিতীয় অভ্যাস, তৃতীয় অপূর্ব্বতা, চতুর্থ ফল, পঞ্চম অর্থবাদ, ও ষষ্ঠ উপপত্তি। যে প্রকরণে যে বিষয় প্রতিপাদিত হইবে সে প্রকরণে আদিতে ও অন্তে সে বিষয়ের উৎকীর্ত্তনকে যথাক্রমে উপক্রম ও উপসংহার কহে; যথা ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকের আদিতে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইহা দ্বারা, এবং অন্তে "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" (অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মকই সকল) ইহা দ্বারা ঐ প্রকরণ প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মেরই উৎকীর্ত্তন আছে। প্রকরণ প্রতিপাদ্য অর্থের পুনঃপুনঃ কীর্ত্তনকে অভ্যাস কহে। যথা ঐ প্রপাঠকেই "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ সেই পরমাত্মাই তুমি। ইহা নয় বার কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রকরণ প্রতিপাদ্য অর্থের প্রমাণান্তর দ্বারা অপ্রাপ্তিকে অপূর্ব্বতা কহে। যথা ঐ প্রপাঠকেই ঐ প্রকরণ প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের বেদান্তাতিরিক্ত প্রমাণ দ্বারা অসম্প্রাপ্তি। প্রকরণ প্রতিপাদ্য অর্থের অনুষ্ঠানের ফলশ্রুতিকে ফল কহে। যথা "আচার্য্যবান্ বেদ" ইত্যাদি "অথ সম্পৎস্যে" ইত্যন্ত গ্রন্থসন্দর্ভ দ্বারা ঐ প্রপাঠকে প্রকরণ প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের জ্ঞানানুষ্ঠানের ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফলশ্রুতি। তৎপ্রকরণ প্রতিপাদ্য অর্থের তৎপ্রকরণে প্রশংসাকে অর্থবাদ কহে। যথা ঐ

প্রপাঠকেই "উত তমাদেশমপ্রাক্ষীঃ" ইত্যাদি "অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্" ইত্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা, যাহা শ্রুত হইলে আর কিছুই অশ্রুত থাকে না, এবং যাহা বিজ্ঞাত হইলে অবিজ্ঞাত বস্তুও বিজ্ঞাত হয়, সেই পরব্রহ্মের প্রশ্ন করিয়াছ, ইত্যাদি প্রকরণ-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের প্রশংসা। তৎপ্রকরণ প্রতিপাদ্য অর্থের সম্ভাব্যতা প্রতিপাদনার্থ যুক্তির উপন্যাসকে উপপত্তি কহে; যথা ঐ প্রপাঠকেই "যথা সৌম্যৈকেন" ইত্যাদি "মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" ইত্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা "যেরূপ এক মৃৎপিণ্ড জানিলেই তাহার বিকার স্বরূপ ঘট সরাবাদি জানা হয়, ঘট সরাবাদি বাক্যদ্বারা কল্পিত নামমাত্র, মৃত্তিকাই সত্য" ইত্যাদি সদৃষ্টান্ত যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। উল্লিখিত ক্রমে শ্রুত অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের বেদান্তানুগুণ যুক্তি দ্বারা অনবরত চিন্তনকে মনন কহে। দেহাদি বিবিধ বিষয়ক বুদ্ধিপরম্পরা পরিত্যাগ পুরঃসর একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বিষয়ক বুদ্ধিধারাকে নিদিধ্যাসন কহে।

সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক ভেদে সমাধি দ্বিবিধ। জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা ইত্যাদি বিকল্পের (অর্থাৎ বিভাগের) বিলয়-নিরপেক্ষ আর তৎসাপেক্ষ পরব্রহ্ম বস্তুতে নিবিষ্ট চিত্তের স্থিরতাকে যথাক্রমে সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক সমাধি কহে। নির্ব্বিকল্পক সমাধি অবস্থায় চিত্তবৃত্তি নির্ব্বায়ু দেশস্থিত প্রদীপ-শিখার ন্যায় নিশ্চল হয়। উক্ত নির্ব্বিকল্পক সমাধির অঙ্গ যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ পাতঞ্জলদর্শনে সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে।

এই নির্ব্বিকল্পক সমাধি সিদ্ধ হইলে তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া ক্রমশঃ জীবন্মুক্ত ও পরমমুক্ত হওয়া যায়। জীবন্মুক্ত তাঁহাকেই

বলা যায় যাঁহার অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মূলাজ্ঞানের নিরসনানন্তর স্ব স্বরূপ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হওয়াতেই অজ্ঞান ও তৎকার্য্য দ্বারা সঞ্চিত সকল কর্ম্ম, সংশয় এবং বিপর্য্যয়াদি নিরস্ত হওয়ায় সকল বন্ধ দূরীকৃত হইয়াছে, এবং যাঁহার "মাংস, শোণিত, মূত্র ও পুরীষ পূরিত শরীর, আন্ধ্য, মান্দ্য এবং অপটুত্বাদি দোষে দূষিত ইন্দ্রিয় সকল, এবং ক্ষুৎ-পিপাসা-শোক-মোহাদি-ভাজন অন্তঃকরণ দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনাজনিত কর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন" ইহা দৃষ্টি গোচর হইলেও পরমার্থ রূপে দৃষ্টিগোচর হয় না, যেরূপ "ইহা ইন্দ্রজালমাত্র" এবম্প্রকার যাহার নিশ্চয় আছে সে ঐ ইন্দ্রজাল দর্শন করিয়াও তাহার পরমার্থত্ব দর্শন করে না। যদিও উক্ত জীবন্মুক্ত ব্যক্তির বৈধ বা নিষিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শুভাদৃষ্ট বা অশুভাদৃষ্ট কিছুই জন্মে না সত্য, তথাপি জ্ঞানী ব্যক্তির নিষিদ্ধ বিষয়ে বিতৃষ্ণ হওয়া উচিত, কারণ যদি জ্ঞানী হইয়াও নিষিদ্ধ বিষয়ের অনুষ্ঠান করেন তাহা হইলে কুক্কুরের সহিত জ্ঞানীর আর ভেদ কি রহিল? জীবন্মুক্ত ব্যক্তির অলঙ্কারের ন্যায় অণিমা প্রভৃতি তত্ত্ব-জ্ঞানসাধন সিদ্ধি এবং দ্বেষশূন্যতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ স্বয়ংই উপস্থিত হয়। জীবন্মুক্ত ব্যক্তির * ভোগ দ্বারা প্রারব্ধকর্ম্ম ক্ষয় হইলে বর্ত্তমান শরীর পতনান্তে পরব্রহ্মপ্রাপ্তি স্বরূপ (অর্থাৎ ব্রহ্মৈকভাব স্বরূপ) পরম মুক্তি লাভ হয়।

এস্থলে দ্বৈতমতাবলম্বীরা মহাবাগাড়ম্বর সহকারে এই এক

* যে কর্ম্ম দ্বারা শরীর হয় তাহাকে প্রারব্ধ কর্ম্ম কহে. ভোগ না হইলে কোন ক্রমেই প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হয় না. একারণ জীবন্মুক্ত ব্যক্তিকেও প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করিবার নিমিত্ত শরীর ধারণ করিতে হয়।

আপত্তি করেন "যদি ব্রহ্মের সহিত জীবের বাস্তবিক ভেদ না থাকে জীবই পরব্রহ্ম স্বরূপ হয়, তবে জীবের অনর্থ-নিবৃত্তি এবং ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি রূপ পরম মুক্তি স্বতঃসিদ্ধই আছে, তন্নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যকতা থাকে না, সিদ্ধ বস্তুর সাধনে কে যত্নবান্ হইয়া থাকে ?" কিন্তু এই আপত্তি কেবল জিগীষা ও স্থূলদর্শিতা প্রভৃতি দোষের কার্য্য বলিতে হইবে, যেহেতু সিদ্ধ বস্তুরও অসিদ্ধত্ব ভ্রম হয় এবং ঐ ভ্রম নিরাকরণার্থ উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হয়; ইহার অবিকল দৃষ্টান্ত, দশ জন মূঢ় ব্যক্তি, নদী পার হইয়া সকলেই আপনাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গণনা করিয়া দেখে যে নয় জন বই হয় না ; তখন তাহারা "আমরা দশ জন আসিয়াছি নয় জন বই হয় না কেন, তবে বোধ করি এক জন কুম্ভীরহত হইয়াছে" এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাহার অন্বেষণ করিতে করিতে ক্রন্দন করে ; কিন্তু যখন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক "দশমস্ত্বমসি" (দশম তুমি) এইরূপ উপদিষ্ট হয়, তখন আপনাকে লইয়া গণনা করাতে "দশ জনই আছি" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অলব্ধ বস্তুর লাভে পরম আনন্দিত হয়, আর এই রূপ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে অন্যমনস্কতা অবস্থায় নিজস্কন্ধে গাত্রমার্জ্জনী রাখিয়া অন্যত্র অন্বেষণ করিতে হয়। অতএব জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও অজ্ঞান নিবৃত্তির জন্য উপায়াবলম্বন করায় হানি কি ? বরং উক্ত যুক্তিক্রমে অবশ্য কর্ত্তব্যই হইতেছে ; অতএব শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ স্থূল যুক্তিরূপ অস্ত্র দ্বারা কখনই হীরক তুল্য অদ্বৈত মত খণ্ডিত হইতে পারে না।

সমাপ্ত।

সূচীপত্র।

সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ।

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক

শ্রীজয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কর্ত্তৃক

বাঙ্গলা ভাষায়

সঙ্কলিত।

দ্বিতীয় বার মুদ্রিত।

কলিকাতা।

মৃজাপুর, অপর সরকিউলর রোড, নং ৫৮।৫

বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

সংবৎ ১৯২১।

বিজ্ঞাপন।

পূর্ব্বকালে এই বঙ্গদেশে বৈশেষিকদর্শন, ন্যায়দর্শন প্রভৃতি ষড়্‌দর্শনের সবিশেষ অনুশীলন ছিল। ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে মিথিলাদেশীয় পণ্ডিতরত্ন গঙ্গেশোপাধ্যায় চিন্তামণি নামক এক খানি উৎকৃষ্ট সংগ্রহ গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থ তদানীন্তন জনগণের সাতিশয় সমাদৃত হওয়াতে মূল গ্রন্থের অধ্যয়নাদি ক্রমশঃ লুপ্তপ্রায় হয়। উক্ত গ্রন্থের উপরি অনেকে অনেক টীকা করেন, কিন্তু মিথিলানিবাসি-জয়দেবমিশ্র-কৃত আলোকনামক টীকাই সকলের মনঃ আকৃষ্ট ও আনন্দিত করিয়াছিল। ৩৫০ বৎসর অতীত হইল, নবদ্বীপনিবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রধান রঘুনাথ শিরোমণি চিন্তামণিগ্রন্থের দীধিতিনামক একখানি টীকা করেন। উহা অতি সংক্ষেপে লিখিত, এবং উহাতে অতিনিগূঢ় ভাব সকল নিহিত আছে, সম্যক্‌রূপে একবার উহার মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিলে আর অন্য গ্রন্থে আদর জন্মে না। বোধ হয়, দীধিতির তুল্য গ্রন্থ পূর্ব্বে হয় নাই, এবং পরে হইবে এমত সম্ভাবনাও নাই। ফলতঃ রঘুনাথ শিরোমণির সদৃশ কল্পনানিপুণ, অসামান্যধীশক্তিসম্পন্ন, সংক্ষিপ্তলেখক গ্রন্থকর্ত্তা আর দ্বিতীয় অনুভূত হয় না। কিন্তু ঐ টীকা অতিশয় কঠিন, এবং উহাতে মূলগ্রন্থের সমুদয় অংশের ব্যাখ্যা নাই, এপ্রযুক্ত উহার প্রতি সর্ব্বসাধারণের অনুরাগ ও আদর জন্মে না। চিন্তামণির উপরি নবদ্বীপনিবাসী মথুরানাথ তর্কবাগীশ যে টীকা করিয়াছেন, তাহাতে মূলগ্রন্থের সমুদায় অংশ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, বিশেষতঃ ব্যাখ্যাকৌশলে দুরূহ স্থল সকল অতিশয় পরিস্ফুত হইয়াছে। অধুনা অনেকেই সমাদরপূর্ব্বক ঐ টীকা অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।

দীধিতির উপরি প্রথমতঃ নবদ্বীপনিবাসী কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য দীধিতিপ্রসারণী নামে এক টীকা করেন। তৎপরে তত্রত্য ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ আর এক টীকা করেন। মথুরা-

নাথ তর্কবাগীশও উক্ত গ্রন্থের একখানি টীকা প্রণয়নে বিরত হয়েন নাই। কিন্তু এক্ষণে ঐ তিন টীকার কোন টীকাই প্রচলিত নাই।

বর্ত্তমানসময়ে, নবদ্বীপনিবাসী জগদীশ তর্কালঙ্কার ও গদাধর ভট্টাচার্য্য বিরচিত দীধিতির টীকাদ্বয়, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী-সহিত ভাষাপরিচ্ছেদ (বৈশেষিকদর্শন-ভাষ্যের সংগ্রহ,) জগদীশকৃত শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, গদাধরকৃত বিভক্তিবাদার্থ, উদয়নাচার্য্যকৃত পরমাত্মনিরূপণ কুসুমাঞ্জলি এবং হরিদাস তর্কাচার্য্য ও রামভদ্র সার্ব্বভৌমকৃত তট্টীকাদ্বয় এই সকল গ্রন্থের অধ্যাপনা হইয়া থাকে, এবং উদয়নাচার্য্যপ্রণীত জীবাত্মনিরূপণ আত্মতত্ত্ববিবেক, রঘুনাথ শিরোমণিকৃত তদ্বিবৃতি ও গদাধর ভট্টাচার্য্যকৃত তট্টীকা (গাদাধরী) এই তিন গ্রন্থেরও কিয়দংশের অনুশীলন হয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, মহর্ষিপ্রণীত দর্শন শাস্ত্র সকলের চর্চ্চা নাই। অধিক কি, কতিপয় বিদ্যোৎসাহী মহোদয়ের প্রযত্ন না হইলে ঐ সমস্ত দর্শনশাস্ত্র এতদ্দেশে একবারে বিলুপ্ত হইত সন্দেহ নাই।

মৃত মহাত্মা কেরি সাহেব কপিলপ্রণীত সাঙ্খ্যসূত্র বিজ্ঞানেশ্বরাচার্য্যকৃত সাঙ্খ্যপ্রবচনভাষ্য সহিত মুদ্রিত করেন; এতদ্দ্বারা অস্মদ্দেশে সাঙ্খ্যদর্শনের প্রচার হইয়াছে। সংস্কৃতপাঠশালার পিতাস্বরূপ মৃত মহানুভব উইলসন্ সাহেব সাতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে ন্যায়দর্শন বৃত্তিসমেত মুদ্রাঙ্কিত করিয়া এতদ্দেশীয় লোকদিগকে চিরবাধিত করিয়া গিয়াছেন। মৃত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বেদান্তদর্শন শঙ্করভাষ্য-সহিত মুদ্রিত করিয়া প্রচারিত করেন। সম্প্রতি আসিয়াটিক্ সোসাইটীর সভ্য মহাশয়েরা দুই টীকাসম্বলিত বৈশেষিক দর্শন মুদ্রিত করিয়াছেন। মীমাংসা ও পাতঞ্জল দর্শন অদ্যাপি কেহ মুদ্রাঙ্কিত করেন নাই; বোধ হয়, উহারাও আর অধিক দিন অপ্রচারিত থাকিবে না।

মহাত্মা উইল্সন্ সাহেব বহুযত্নে মাধবাচার্য্যপ্রণীত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ নামক সংগ্রহ গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় আনয়ন করিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল গত হইল, আসিয়াটিক্ সোসাইটীর সভা

মহাশয়েরা ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া প্রচারিত করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য উহাতে সংক্ষেপে ১ চার্ব্বাক, ২ বৌদ্ধ, ৩ আর্হত, ৪ রামানুজ, ৫ পূর্ণপ্রজ্ঞ, ৬ নকুলীশপাশুপত, ৭ শৈব, ৮ প্রত্যভিজ্ঞা, ৯ রসেশ্বর, ১০ ঔলূক্য (বৈশেষিক), ১১ অক্ষপাদ (ন্যায়), ১২ জৈমিনি (মীমাংসা), ১৩ পাণিনি, ১৪ সাঙ্খ্য, ১৫ পাতঞ্জল এই পঞ্চদশ দর্শনের সারসংগ্রহ করিয়াছেন; অন্যান্য সংগ্রহগ্রন্থে বিস্তারিত রূপে শাঙ্কর দর্শনের তাৎপর্য্য প্রকটন করিয়াছেন বলিয়া এই গ্রন্থে তাহার সংগ্রহ করেন নাই। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এবং উহা সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মহোপকারক। এই গ্রন্থের আলোচনায় পঞ্চদশ দর্শনের মর্ম্মগ্রহ হওয়াতে বহুদর্শিতা ও বিজ্ঞতা জন্মে। বিশ্ববিখ্যাত, অসামান্য ধীসম্পন্ন, বিবিধ বিদ্যাসমুদ্র শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যৎকালে সংস্কৃতবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন তৎকালে তিনি আমাকে ঐ পঞ্চদশদর্শন ও শাঙ্করদর্শনের স্থূল মর্ম্ম সকল বঙ্গভাষায় সঙ্কলিত করিয়া প্রচারিত করিতে কহেন। তিনি যৎকালে সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়ন করিতেন তৎকালে আমার নিকট দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অতিশয় অনুরাগ আছে। তাঁহার প্রবর্ত্তনানুসারে আমি এই পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু আমাকে বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতে হয়, এবং অবশিষ্ট সময় বাটীতে বিদেশীয় ছাত্রগণকে অধ্যয়ন করাইতে হয়, সুতরাং আমার অধিক অবকাশ না থাকাতে মদীয় ছাত্র শ্রীমহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নকে কিয়দংশ লিখিতে ভার অর্পণ করি।

ইনি মণ্ডলঘাট পরগণার অন্তঃপাতি নারিটগ্রামবাসি ভট্টাচার্য্যগোষ্ঠীসম্ভূত, শোভাবাজারস্থ রাজবাটীর সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের পুত্র। ইনি অতিতীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন। ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি ও দর্শন শাস্ত্রে ইহাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে। অধুনা যাঁহারা সমাজস্থানে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগের অনেকেই রঘুনন্দনকৃত নব্য স্মৃতির কতিপয় গ্রন্থ ও দায়ভাগ পাঠ করিয়া কৃতার্থম্মন্য

হয়েন, কেহ কেহ প্রায়শ্চিত্তবিবেক ও শ্রাদ্ধবিবেকও অধ্যয়ন করিয়া থাকেন; কিন্তু প্রায় কেহই সমুদায় গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন না। আর যাঁহারা ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশই প্রথমতঃ ভাষাপরিচ্ছেদের ব্যাপ্তিনিরূপণ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া, অনুমানখণ্ডের মাথুরী (মথুরানাথকৃত টীকা), জাগদীশী (জগদীশকৃত টীকা), ও গাদাধরীর কতিপয় পত্র অধ্যয়ন করেন; পরে প্রত্যক্ষখণ্ডের প্রামাণ্যবাদের ৫।৬ পত্র, বৌদ্ধাধিকারের ৫।৬ পত্র, কুসুমাঞ্জলির দুই স্তবক, শব্দখণ্ডের মাথুরীর যৎকিঞ্চিৎ, এবং শব্দশক্তিপ্রকাশিকা ও ব্যুৎপত্তিবাদের কিয়দংশ অধ্যয়ন করেন। পরিশেষে সভায় প্রতিপত্তিলাভের নিমিত্ত পত্রিকা (পাতড়া) সকল কণ্ঠস্থ করিয়া পাঠ সমাপন করেন। ফলতঃ পত্রিকাবিদ্যার উপরি তাঁহাদিগের অনেকেরই নির্ভর। কিন্তু মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, বৈশেষিকদর্শন, তদ্ভাষ্য, কিরণাবলী, ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, বৈশেষিক সূত্রোপস্কার, ন্যায়সূত্র, তদ্বৃত্তি, কপিলসূত্র, তদ্ভাষ্য, সাঙ্খ্যকারিকা, তত্ত্বকৌমুদী, পাতঞ্জলসূত্র, তদ্বৃত্তি, তদ্বিবৃতি, বেদান্তসূত্র, শঙ্করাচার্য্যকৃত তদ্ভাষ্য, পঞ্চদশী, বেদান্তসার, বেদান্ত পরিভাষা, চিন্তামণি, দীধিতি, মাথুরী, জাগদীশী, গাদাধরী, শব্দখণ্ডের আলোক, তন্মাথুরী, শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, ব্যুৎপত্তিবাদ, নঞ্‌বাদ, শক্তিবাদ, ক্ত্বাবাদ, আখ্যাতবাদ, মুক্তিবাদ, মুক্তিবিচার প্রভৃতি নব্য ও প্রাচীন গ্রন্থ সকলের আদ্যন্ত সমুদায় অধ্যয়ন করিয়াছেন, এবং শ্রীহর্ষকৃত খণ্ডনগ্রন্থ ও শিরোমণি কৃত খণ্ডনগ্রন্থ উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন, অলঙ্কারশাস্ত্রের কাব্যপ্রকাশ ও সাহিত্যদর্পণ এবং স্মৃতি শাস্ত্রের নব্য তত্ত্ব সমুদায়, এবং প্রাচীন মিতাক্ষরা, শ্রাদ্ধবিবেক, প্রায়শ্চিত্তবিবেক, দায়ভাগ, বিবাদচিন্তামণি, দত্তকচন্দ্রিকা, দত্তক মীমাংসা প্রভৃতি গ্রন্থ সকলের তদাদি তদন্ত সমুদায় পাঠ করিয়াছেন; অধিক কি, ইঁহার ঈদৃশ ক্ষমতা জন্মিয়াছে যে, অতিদুরূহ সংস্কৃতগ্রন্থেরও অনায়াসে ব্যাখ্যা করিতে পারেন। ইনি এই পুস্তকের কিয়দংশ লিখিয়া আমার পরিশ্রমের অনেক লাঘব করিয়াছেন।

প্রায় দুই বৎসর হইল, এই পুস্তক সঙ্কলিত হইয়াছে। অধুনা সংস্কৃতবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বিদ্যাবুদ্ধিসমুদ্র শ্রীযুক্ত ই, বি, কাউএল্ এম. এ. সাহেবের আনুকূল্য ও উৎসাহে ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। এই পুস্তক সংস্কৃত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া সঙ্কলিত হইয়াছে ; ইহা ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। যে যে স্থান অপ্রয়োজনীয় ও বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইলে সহজে হৃদয়ঙ্গম হওয়া দুরূহ বিবেচনা হইয়াছে, তৎসমুদায় এককালে পরিত্যক্ত হইয়াছে ; আর যে যে বিষয় সংক্ষেপে লিখিত ছিল, তৎসমস্ত বিশদ করিবার মানসে বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে, এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে যে সমস্ত প্রকৃতোপযোগী বিষয় প্রাপ্ত হওয়া গেল, তাহাও বিনিবেশিত হইল। ফলতঃ গ্রন্থ সংলগ্ন ও সাধারণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই ; অধিক কি, স্থানে স্থানে ভাষার অপকৃষ্টতাও স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু এরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না যে, সকলেই দৃষ্টিমাত্রে ইহার মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হইবেন, যে হেতু দর্শন শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য অতিদুরূহ ও সুকঠিন, অধ্যয়ন করিলেও উহাতে সকলের ব্যুৎপত্তি জন্মে না। তবে এইমাত্র নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, মনোনিবেশপূর্ব্বক এই পুস্তক আদ্যন্ত পাঠ করিলে স্থূলরূপে দর্শনশাস্ত্র-সকলের অনেক তাৎপর্য্যগ্রহ হইবে।

মাধবাচার্য্যের সংগৃহীত বৌদ্ধদর্শন প্রভৃতি কয়েকটী দর্শনের অবিকল অনুবাদ করিলে কোন ক্রমে অর্থাবগতির সম্ভাবনা নাই, এবং ঐ সকল দর্শনানুযায়ী পুস্তকও এতদ্দেশে প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন ; সুতরাং তৎসমুদায় বিশদরূপে অনুবাদিত হইবার সম্ভাবনা না থাকায়, যে যে অংশ পরিস্ফুট, তাহাই সঙ্কলিত হইল, এবং যে যে অংশ অন্য গ্রন্থসাপেক্ষ তাহা একবারে পরিত্যাগ করা গেল। আমার মানস আছে, যদ্যপি ঐ সমস্ত দর্শনানুযায়ী পুস্তক প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করিবার সময় ঐ সকল বিষয় বিস্তারিত করিয়া লিখিব। ন্যায়, বৈশেষিক, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি কতিপয় দর্শনের মূল এবং তদুপযোগী

অন্যান্য সংগ্রহগ্রন্থ এতদ্দেশে দুর্লভ নহে, সুতরাং ঐ কয়েকটী দর্শন বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে। যদিও মাধবাচার্য্য স্বকৃত অন্যান্য সংগ্রহগ্রন্থে শাঙ্করদর্শন লিখিয়াছেন বলিয়া সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে তাহার সংগ্রহ করেন নাই, কিন্তু বঙ্গভাষায় ঐ দর্শনের অসদ্ভাব থাকা প্রযুক্ত অন্যান্য গ্রন্থ হইতে সঙ্কলনপূর্ব্বক উহাও সন্নিবেশিত হইল। এক্ষণে এই পুস্তক পাঠ দ্বারা দেশীয় বিদ্যার্থিগণের দর্শনশাস্ত্র সকলের মর্ম্মগ্রহ হইলে সমুদায় শ্রম সফল বোধ করিব।

পরিশেষে এইমাত্র বক্তব্য যে, এই পুস্তক মুদ্রিত করিবার সময় শ্রীগৌরীশঙ্কর ঘোষাল আমার অনেক সাহায্য করিয়াছেন। ইনি সংস্কৃত কালেজের একজন সুশিক্ষিত প্রধান ছাত্র এবং অতি সুবুদ্ধি ও সচ্চরিত্র। ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি ও দর্শন-শাস্ত্রে ইঁহার উত্তম সংস্কার জন্মিয়াছে এবং ইংরাজী ভাষাতেও সম্যক্ ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। ইনি এই পুস্তকে বঙ্গভাষার সৌষ্ঠব করিবার নিমিত্ত অনেক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন।

সংস্কৃত কালেজ।
সংবৎ ১৯২১।
২৫এ আষাঢ়।

শ্রীজয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন।